চতুর্থ অধ্যায়

বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের অবক্ষয় চিত্র ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প

''কোথায় লড়াই হয় রাজায় রাজায়
ধানের মরাই মোর খালি হয়ে যায়,
খালি হয়ে গেল মোর চালভরা জালা
বন্ধক পড়েছে কবে বাটি আর থালা।''[১]

ইউরোপের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের গর্ভে একটি নতুন গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ধনতন্ত্রের হাত ধরে। এতে শহরের উদীয়মান বণিক শ্রেণি নেতৃত্ব দেয়। এই বণিক কুলই হয়ে ওঠে সভ্যতার নিয়ামক শক্তি। চতুর্দশ শতকে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে যে বণিক শ্রেণি গড়ে ওঠে, কালক্রমে তারাই ইংরেজের 'Middle class' কথাটির সমর্থক হয়ে ওঠে। রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি একপ্রকার এদের দ্বারাই, বলে রাখা ভাল এদের স্বার্থেই হতে থাকে নিয়ন্ত্রিত। ফলে ভূমি স্বার্থে জড়িত সমস্ত অভিজাতদের সঙ্গে এদের সংঘাত বাধে। এই সংঘাত বংশ মর্যাদা বা কৌলিন্য বা আভিজাত্যে নতুন মূল্যবোধের কাছে পরাজিত হয়। মানবতাবাদ ছিল এই শ্রেণির আদর্শ। কিন্তু আমাদের কাছে এই সভ্যতা আসে ঔপনিবেশিক স্বার্থে। মেকেলের কেরাণীগিরির ইংরেজি শিক্ষা, চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত, চা-শিল্প প্রভৃতি সভ্য সভ্যতার স্বাদ দেয়, তবে সামন্ত প্রথা আমাদের আর ভাঙ্গা হয়ে ওঠে না। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের, ফলে আমাদের জমিদার পরিবর্তিত হয় কিন্তু সভ্যতা থেকে যায় ভূমি নির্ভরই; 'old wine in a new bottle' -এর মত পরিবেশন একপ্রকার। মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষায় প্রাপ্ত চাকুরী ও চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের হাত ধরে গড়ে ওঠে আমাদের মধ্যবিত্ত। শুরুতে তারা শাসক শ্রেণির স্বার্থেই হতে থাকে ব্যবহৃত। আর ''কথাসাহিত্য একই সাথে সমাজ বাস্তবতা ও সমাজ বিবর্তনের। সামন্তবাদের ভাঙন ও পুঁজিবাদের প্রগতিবাদী বিকাশের ফলে এর জন্ম।''[২] তাই আমাদের এই সমাজের সমাজ বাস্তবতায় কোনো পূর্ণাঙ্গ কাহিনি রচনা হয়নি। নক্সা হয়েছে কিছু। এ পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাস্তবতা থেকে রোমান্সেই ডুবে রইলেন। —

''ঝড় শেষ। দক্ষিণের দয়ালু বাতাস ফের হায়

বলে তবে ফুলে ওঠো, হে গোটানো পালের মালিক
খুলে দাও দড়িদড়া, উড়ে যাক সমুদ্র শালিক,
একটি গাঙ চিল দেখো কম্পাসের কাঁটা হয়ে যায়।''[৩]

কথাসাহিত্যের বাঁক প্রবাহ ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে। সময়ক্রমে নীল বিদ্রোহের পরবর্তী নানা পর্যায়ে গণমুখী প্রবণতা দানা বেঁধে ওঠে। প্রশ্ন উঠতে পারে সাঁওতাল, মুণ্ডা, তিতুমীরের বিদ্রোহে যা হয়নি 'নীলবিদ্রোহ' ঘিরে কেন তা হল? উত্তরে বলা যেতে পারে এতে মধ্যবিত্তের স্বার্থও জড়িত ছিল। নীলবিদ্রোহে জমিদাররাও অত্যাচারিত হয়েছিল এবং ১৮৭০ -পর থেকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বাংলা নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত উগ্রভাবে ঐতিহ্যবাহী হয়ে ওঠে। যাইহোক কথাসাহিত্যে তখনো মানবিক কাহিনি ও দৈনন্দিন জীবন বাস্তবতার অপরিহার্য উপাদান তৈরি হয়ে ওঠেনি।

''পথে যেতে যেতে শুনি এক বটবৃক্ষের নালিশ
হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাই। শুনি লক্ষ পাতার মর্মর;
গাছের আঠালো কষ ঝড়ে পড়ে মাথার ওপর
উৎকর্ণ বিবশ চিত্তে বিদ্ধ হয় শালিকের শিশ্।''[৪]

পরিবর্তন এলো লক্ষ মানুষের মেশিন গানের হাত ধরে। শোনা যায় শত নগরীর লক্ষ মানুষের আর্তনাদে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কলতান। গাছের আঠালো কষের মতো করে মানবদেহে প্রবেশ করে হিংসার নাইট্রিক অ্যাসিড। শালিকের শিসের ন্যায় মানব কণ্ঠ বিদ্ধ হয় গুলির আঘাতে। যুদ্ধ বড় ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর তার লেলিহান জিহ্বা। শুধু যুদ্ধ নয় 'অক্টোবর বিপ্লব' ও মানব জীবনের স্থবিরতাকে গতিদান করতে পরোক্ষে সাহায্য করে। পৃথিবীর বুর্জোয়াবাদের বিরুদ্ধে উপেক্ষিত শ্রমিক শ্রেণি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সামনে চলে আসে। অক্টোবর বিপ্লবের পর গোটা দুনিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত ও স্তর পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়টা বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থার সংকট, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা, বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিস্তার, সাম্যবাদী দর্শনের বিভিন্ন দেশে দেশে তার সামাজিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী ব্যাখ্যা ও তত্ত্বের উদ্ভাবন। লেনিনবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের ঢেউ এদেশের মানুষের মধ্যে বৃটিশ শাসনের ভুলভ্রান্তি গুলিকে ধরিয়ে দেয়। তাছাড়া ১৯১৭ বলশেভিক বিপ্লব গোটা পৃথিবীতে চমক আনে। ১৯১৭

থেকে ১৯২১ অবধি রচিত ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি দেশ সচেতন তরুণ সমাজের বুদ্ধি ও চেতনার পরিবর্তন আনলো। এসব বিপ্লব দর্শন ও সমাজ দর্শনের পাশাপাশি এলো ফ্রয়েডীয় গবেষণা এবং অপরদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ব্যর্থতা, গ্লানি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পরিবর্তন আনলো। মানুষের 'ব্যক্তি' আমির ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা সাহিত্যে প্রকাশ পেতে লাগলো।

> ''মানুষকে কোথাও না কোথাও অবশ্যই যেতে হয়
> কোনো এক চিহ্নিত গন্তব্যে তাকে যেতে হয় বলে
> এই অস্থিরতা এই অক্লান্ত ভ্রমণ।''[৫]

মানুষের পরিক্রমাই শুধু নয় মানুষের পাশে তাদের দলিল চিত্র সাহিত্যও সময় প্রবাহে ভ্রমণ করে। সাহিত্যে 'কল্লোল' 'কালি কলম' 'প্রগতি' প্রভৃতির মাধ্যমে যে প্রগতিবাদ শুরু হয় বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) , সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) হয়ে সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২), বিমল করের (১৯২১-২০০৩) হাতে আজও তা বহমান। ইতিমধ্যে ঘটে যায় আরেকটি রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন 'জাতীয়তাবাদী'র সূত্রে ভাগ হয় ভারত ও পাকিস্তান। এই পাকিস্তান আবার দুই ভাগে ভাগ হয়; নামকরণ করা হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় দেরিতে জাগরণ প্রাপ্তি ঘটে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের। স্পন্দন প্রাপ্তিতে সজাগ হবার পরে দুই বিশ্বযুদ্ধের ক্ষুধার মধ্যে পড়ে যায় এই সমাজ। দেরিতে জাগরণের জন্য হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে পাল্লা না দিতে পারায় তৎকালীন শাসকেরা, নেতারা মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজকে স্বপ্ন দেখায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের। বৃহৎ ভারত রাষ্ট্র হিন্দু-মুসলমান দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়। আবার 'বাঙালি' ও 'মুসলমান' দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয় পাকিস্তান। এতসব ভাগাভাগির পরও মূল দ্বিজাতি তত্ত্বটি রয়ে যায় অমিমাংসিত। তা হল 'ধনী' ও 'দরিদ্রের' দ্বিজাতি তত্ত্ব। তাই 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে সত্য-মিথ্যা' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি বলেন—

> ''হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বলে কোনো সমস্যা নাই যাঁরা বলেছিলেন
> তাঁরা মিথ্যা বলেছিলেন। সমস্যা ছিল। সমস্যাকে অস্বীকার করার
> ফলাফল ভয়ঙ্কর হয়েছে। ঠিক তেমনি বাঙালি-অবাঙালির মধ্যে

বিরোধ নেই যারা বলেছিলেন তারাও ভুল করেছিলেন। তার ফলাফলও আমরা দেখেছি। আজ ধনী ও দরিদ্রের বিভাজনকে প্রধান সমস্যা বলে মান্য না করলে আবারও আমরা ভুল করব।''[৬]

প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর দ্বিজাতি তত্ত্বের সৃষ্টির মূলে ধনী-দরিদ্রকে টেনে আনেননি তিনি 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে ধর্মকেই টেনে এনেছেন—

''ধার্মিকের চিরকৌমার্যের প্রতি হিন্দু সমাজের একটা অস্বাস্থ্যকর পক্ষপাত আছে এবং বিধবার পক্ষে এই হলো বিধি। এগুলি হয়তো আমাদের তিব্বতি ও দ্রাবিড় পূর্ব-পুরুষের কাছে পাওয়া সংস্কার। এমন একটি সংস্কার আমাদের গোভক্তি। যারা ছাগরক্তে কালীঘাট ধৌত করছে, বলিদানে মহিষাসুর বধ করতে যারা দ্বিধাবোধ করে না, গোমাতাকে প্রহার করা যাদের নিত্য কাজ তারাই মুসলমানের প্রতি ঘৃণায় কন্টকিত, ওরা যে গরু খায়! এসব সংস্কার যে কত বিসদৃশ ইসলাম গ্রহণ করলে এক মুহূর্তে বোঝা যায়।''[৭]

এর ঠিক উল্টো হতেও দেখা যায় শূকর খাবার অভিযোগ আমরা মুসলমান সমাজকে হিন্দুর প্রতি করতে দেখি। যদিও এসব কিছুই না বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমান সমাজকে ধনী-দরিদ্র এবং ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করে মধ্যবিত্ত সমাজকে শোষণের হাতিয়ার করে স্বার্থ সন্ধানী ব্যক্তিবর্গরা। রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' গ্রন্থের 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে এর সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ক্রমে '৫২-র ভাষা আন্দোলন '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ পেরিয়ে আজকের বাংলাদেশ। মধ্যবিত্ত সমাজ এই বিদ্রোহগুলি থেকে নিজেদের গা বাঁচিয়ে গৃহকন্দরে লুকিয়ে রাখেনি; মধ্যবিত্তের প্রত্যেকেই এই আন্দোলনগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

''পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র যেমন চলছে তেমনি বাঙালির, বিশেষত শিক্ষিত শহুরে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বাঙালির, প্রতিরোধেরও শেষ ছিল না।''[৮]

সেই মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা কেমন এবং মুক্তি যুদ্ধের প্রাঙ্গণে অংশগ্রহণ করেও বাংলাদেশের সমাজ এত স্থবির কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আবুল মোমেন তাঁর 'মধ্যবিত্ত : ভাসমান,

শৌখিন, ক্ষয়িষ্ণু', প্রবন্ধে তা তুলে ধরেছেন বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যবিত্তদের কিছু ত্রুটি ও বিচ্যুতি। ক্রমে তা তুলে ধরা হল—

> ক. বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত খুবই রাজনীতি সচেতন হলেও মধ্যবিত্তের বিকাশ যে সব শর্তের উপর নির্ভরশীল, যেমন নগর ও নাগরিক সুবিধাদির বিস্তার; কর্মসংস্থান ও কর্ম বাছাইয়ের সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ইত্যাদির আশানুরূপ উন্নতি এদেশে আজও হয়নি।
>
> খ. এদেশে মধ্যবিত্তদের শিকড় আজও গ্রামে।
>
> গ. মধ্যবিত্তদের বিকাশের অনুকূল অর্থনৈতিক অবকাঠামো এখনো দাঁড়ায়নি, তাই মধ্যবিত্তের সমাজ এখানে অস্থিতিশীল।
>
> ঘ. শিক্ষা ও ডিগ্রির মূলে উপযুক্ত চাকুরির কোনো নিশ্চয়তা নেই, দেশে এখন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।
>
> ঙ. যেকোনো মানের সামান্য লেখাপড়া জেনে মূলত রাজনৈতিক যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে একেবারে ক্ষমতার কেন্দ্রে, বৈধ-অবৈধ উপার্জনের মোহনায় পৌঁছে যাওয়া যায়।
>
> চ. রাষ্ট্রই মধ্যবিত্তের দোলায় আন্দোলিত হয়, রাষ্ট্রের ঝাঁকুনির সবটা দায় পোহায়, এছাড়া তার সকল অস্থিরতার দায় বহন ও শোধ করে এই সমাজ ব্যবস্থা।
>
> ছ. সামন্ত শৃঙ্খল ভাঙেনি, ভাঙার মতো উপযুক্ত অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে নেই এবং তার ত্রুটি-ঘাটতি-খুলে ধরার মতো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে সমাজ গ্রাহ্য করে না।[৯]

ফলে সমাজ ও মধ্যবিত্ত ভোগে গভীর বিকারগ্রস্থতায়। শওকত আলী (১৯৩৬ -), জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (১৯৩৯ -), বশীর আলহেলাল (১৯৩৬ -), রাহাত খান (১৯৩৯ -), রিজিয়া রহমান (১৯৩৯ -), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), রশীদ হায়দার (১৯৪১ -), সেলিনা

হোসেন (১৯৪৭ -), সুব্রত বড়ুয়া (১৯৪৬ -) প্রমুখ লেখকের লেখার মধ্যেও বর্তমান বাংলাদেশের চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)-এর গল্পে ফুটে ওঠে বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতির কারণ, তৎজনীত জীবনান্দোলন এবং বিবৃতিগুলিও। ইলিয়াসের রচনা প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য এখানে একটু দেখে নেওয়া খুবই প্রয়োজন বলে বোধ করি—

> ''টেকনিকের কোনো নিজস্ব ইতিহাস নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে টেকনিকের ইতিহাস দেশকালের সাধারণ ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। যেহেতু টেকনিক স্বয়ম্ভূ নয়—আঙ্গিক রীতির মূলে থাকে বক্তব্যের চাপ ও তাগিদ, এবং যেহেতু সেই চাপ এবং তাগিদের প্রধান কথা হল জীবন সংক্রান্ত নতুন অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধের নিরিখ স্থাপন—তাই বলা যায় টেকনিকের ইতিহাস জীবনেরই ইতিহাস।''[১০]

ইলিয়াস সাহেবও জীবনেরই ইতিহাস নিয়ে কারবার করেছেন। তাঁর কারবারির লভ্যাংশ হল তাঁর সৃষ্ট ২৩টি গল্প তথা পাঁচটি গল্পগ্রন্থ। এখানে মধ্যবিত্ত মানসের অবক্ষয় চিত্র সূচিপত্রের মতো করে ক্রমপর্যায়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে। যার মমার্থ আমাদের বুঝে উঠতে বেগ পেতে হয় না; এমনকি আমরা তাঁর গল্প থেকে সহজেই মধ্যবিত্ত মানসের অবক্ষয় চিত্রকেও বুঝে উঠতে পারি বলে মনে হয়। এছাড়াও সরোজবাবু জানান, লেখকদের বুঝতে হলে যে তাঁদের 'Techniques' এবং 'Form' -এর দিকেও নজর দিতে হয় সে বিষয়ে তাঁর ১৩৭২ সালে 'ছোটগল্প : নবনিরীক্ষা' নামের ক্ষুদ্র বইতে 'নিরীক্ষার নীতি' প্রবন্ধের সূচনাতেই কিছু কথা জানিয়েছেন যা আমাদের দৃষ্টিকে গভীরতা দান করে। এখানে আমরা পাশ্চাত্য ব্যক্তি টেরি ঈগলটন এবং প্রাচ্য ব্যক্তি বিষ্ণু দে-র মতো মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের আঙ্গিক গঠন বিষয়ের ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় সরোজবাবুর বক্তব্যে। তবে এই আঙ্গিক বিষয়ে অধুনা বাংলাদেশের ইলিয়াস সাহেবকে কিন্তু পিছনের বেঞ্চে বসানো যায় না। যদিও ইলিয়াস তাঁর গল্পে তত্ত্ব ব্যবহার করেননি কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর গল্পগুলি গোপন গহ্বরে তত্ত্বকথাকে লালন করেছে বলে বলা যায়। মার্কস প্রয়াণের অল্প কিছুকাল পরেই গল্পকার এঙ্গেলস স্বীকার করে জানিয়েছিলেন শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিকের গুরুত্ব তাঁরা পূর্বে ততটা অনুধাবন করেননি ঠিকই,

কিন্তু আঙ্গিকের গুরুত্ব অনেক বেশি। এই আঙ্গিক ইলিয়াসের হাতে সৌন্দর্য শোভা ছড়িয়েছিল; যা তাঁর গল্প বিশ্লেষণে বোঝা যাবে। অবশ্য মার্কস-তাত্ত্বিকেরা আঙ্গিক বলতে 'form' বুঝিয়ে ছিলেন; আর সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বুঝেছিলেন 'techniques' সে যাইহোক মূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে আঙ্গিক প্রকরণের আলোচনা করলে তা ভুলের খাতা পূর্ণ করবে বলে মনে হয়। বিষয়ের সঙ্গে জারিত করেই আঙ্গিক প্রকরণের গুরুত্ব আমাদের বুঝে নিতে হবে। আঙ্গিক প্রকরণের অন্যতম দিক হিসেবে ইলিয়াস তাঁর রচিত গল্পে মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয় চিত্রকে অনন্য মর্যাদা দান করেছেন।

ইলিয়াস পূর্বকাল পঞ্চাশ বৎসরের সময় পূর্বে গল্প সাহিত্যে নতুন ধারা যে আসে তা অস্বীকার করা যায় না, দুই বঙ্গের গল্প রচয়িতাদের হাতেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গল্পে রীতিতে যে বাঁক বদল আসে সেখানে গল্পের চালচিত্র হিসেবে বাইরের বাস্তব জগতের গুরুত্ব গৌণ হয়ে আসে। গল্পের ঘোড়ার লাগাম টেনে তাকে মোর দেওয়া হয় অন্তর্মুখিনতার দিকে। তবে যত অস্পষ্টই হোক একটি গল্পের আভাস ও কিছু চরিত্রের রেখাপাত রাখা যে অবশম্ভাবী তা ‘গল্প’ অভিধার যে কোনো রচনায় পাওয়া যায়। আর তাকে মেনে নিতে হয়েছে এই সময় পর্বের প্রত্যেক লেখক শিল্পীদেরকে। কিন্তু একটা সমস্যা গল্পকাররা অনুভব করে, প্রাত্যহিক বাস্তবতার যুক্তিগ্রাহ্য গতিপথে গল্প সমগ্রে বিকশিত হয় না সকল গল্পের কাহিনি ও চরিত্রেরা। ধরাবাঁধা নিয়মের মতো স্পষ্ট বক্তব্য নয়, মানবচিত্তের আলো-অন্ধকারময়, আবহ অনুধাবন হবে গল্পের কেন্দ্রীয় পটের উপলব্ধিতে। গল্পে কখনো ব্যবহার হতে দেখা যাবে উদ্ভট ও রহস্যময় প্রতীক, কখনো গল্পের শিল্প কাঠামো রীতি হবে যন্ত্রনির্ভর বাঁধা ছকের মতো। সমগ্রতার লক্ষণে আমরা গল্পের ভুবনে সাধারণত গল্প অনুভবে বিষাদের সুরকে এই সকল লেখায় দেখতে পাওয়া যায়। যদিও এই সময় পর্বের লেখায় বিষাদের সুর প্রকাশে লেখকের ব্যক্তিজীবন নয় সমাজ জীবনের প্রভাবকেই অতি মাত্রায় গ্রহণ করতে হয় আমাদের।

ক্রমে গল্প সাহিত্য পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের দশকে তার কাঁধের গল্প ঝাঁপি নামিয়ে পসরা সাজিয়ে জাকিয়ে বসে তবে এই সময় কালের নতুন গল্পগুলি কিন্তু বস্তুত বাস্তব-বর্জিত নয়। সমাজ ভূমির যে বিষাদ এই সময়ের ব্যক্তি চরিত্রগুলিকে আবিষ্ট করে রাখে তার মূল থেকে যায় সমাজ-পরিস্থিতির অন্দর মহলেই। সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য, আর্থিক অসামঞ্জস্য, বিত্তভিত্তিক সমাজ শাসন, মানব সভ্যতার অন্ধকার গুহায় লগ্ন হয়ে থাকা লোভ-ঈর্ষা-হিংস্রতা-

প্রতারণা-পীড়ন এই সকল বাতাবরণ থেকেই এই সময়ের গল্পভুবন গড়ে উঠেছে। এই সময় পর্বের মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থান বুঝতে গল্প সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী সুগভীর চিন্তাপ্রসূত ভাবনা আমাদের দেখে নিতে হয়; একটু দেখে নেওয়া যাক—

> ''যে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির ব্যবস্থার অন্তর্গত বিত্তহীন অক্ষম মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দ্যাখান তারা সর্বোতোভাবে আত্মপ্রবঞ্চক তাদের চাওয়ার অর্থ সামান্য কয়েকটা পয়সা, বিনোদন, দিবা স্বপ্নে, প্রভুত্ব অসহায় স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের উপর, ভোগের উপকরণ স্ত্রীর দেহ আর বীরত্বের আস্ফালন কয়েকটি ইঁদুর ধরা পড়ায়।''[১১]

নিতান্তই খারাপ বলেননি। সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত জীবনের এই প্রকার অবক্ষয় যে ষাটের দশকে দেখা যায় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প বিশ্বে এই সময় পর্বের মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয় চিত্র খুবই ম্যাপ্তেলের প্রকট বৈশিষ্ট্যের ন্যায় সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে; গল্প পাঠে তার যথাযথ প্রমাণ উঠে আসে। এই মুহূর্তে বলে রাখা ভালো যে একটা সার্বিক সামাজিক অনিশ্চয়তা থেকেই জন্ম হয় এই ধরণের গল্প। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপে ও লাতিন আমেরিকায় এই ধরণের গল্প রচনার ধারা ক্রমবহমান। অকতাভিও পাজ, আলো হ্রোব গিয়ে, হোহে লুই বোর্হেস -আরো অনেকেই পাশ্চাত্য দেশের খ্যাতিমান ব্যক্তিরা এই নতুন আন্তর্বাস্তবতার গল্প নিয়ে নানান কাটাছাঁটা করে চলেছেন; যার কিঞ্চিৎ রেশ আজও রয়ে গেছে বলে মনে হয় গল্প সাহিত্যে। এই সকল পাশ্চাত্য ভাবনা বাংলার গল্প সাহিত্যে আসেনি বললে ভুল হবে কারণ বাংলার গল্পকারও তাঁদের সম্পর্কে কমবেশি খোঁজ খবর রাখত। এই খোঁজ খবরের চিহ্নগুলি তাঁদের গল্প শরীরে প্রকাশ পেতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে বলতে বাধা নেই 'শাস্ত্রবিরোধী' গল্প এবং নব্য অন্তর বাস্তবতার গল্প বাংলা সাহিত্যের গল্প বিশ্বের প্রবহমান ধারায় আরেকটি বাঁকবদল ঘটায় আর এই বাঁক বদল করার ইতিহাসকে একেবারেই উপেক্ষা করা যায়না। এই সময়কালের কিছু খারাপ দিকও নজরে আসে এই সময় থেকে স্ফীত হয়ে ওঠা বাণিজ্যিক গল্পধারার পাশে গা বাঁচিয়ে অন্তর বাস্তব জগতের গল্পগুলি ক্ষীণ স্রোতপ্রাপ্ত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই বৃহৎ পাঠক সমাজের কাছে এই ধারা প্রবাহ শৈলশিরা অতিক্রম করে পৌঁছতে পারেনি। আর তাই তেমনভাবে সাফল্যও পায়নি। এই সময়কালে ইলিয়াস কিন্তু কোনো দলেই নিজের শরীর

প্রবাহকে চালিয়ে দেননি। তিনি নিজে সমাজের কাছে গিয়ে সমাজের অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন্ত রূপকেই তুলে আনতে সদাব্যস্ত থেকেছেন। মিথ্যা বলব না তিনি প্রত্যেক ধারারই কাছে গেছেন এবং তাঁর গল্পে কোরাস সুর ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করতেন বলে মনে হয় তার গল্প জগতে।

ষাট অতিক্রম করে সত্তর দশকে মুক্তি যুদ্ধের সময় পর্বে যাবার পূর্বে আমাদের সত্তর দশকের গভীর এক ক্ষতকে মনে স্মরণ করে এগোতে হবে; এই ক্ষত হল নকশালবাদী আন্দোলন। আর এই সত্তর দশকের গল্প সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলার আগে বহুজন শ্রুত নিউটনের তৃতীয় গতি সূত্রটিকে স্মৃতি হাতরে একবার মনে তুলে আনতে হয়। জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থানরত এই বিজ্ঞানী জানিয়েছিলেন—

''প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।''—আর এটাই স্বাভাবিক। ঠিক তেমনিভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাল, লুণ্ঠিত মানসিক স্বাধীনতা পুনঃপ্রচেষ্টার দলিল রূপে সত্তর দশক ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। এখন আমাদের একটু খুঁজে দেখতেই হয় কেন এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া? সন্ধানে যে সকল দিকগুলি উঠে এসেছে তার রূপাবয়ব এই রকম—

ক. প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ফ্যাসিবাদের উত্থান জন সাধারণের জীবন সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

খ. যুদ্ধ থেমে যাবার পর বাজার দখলের লড়াই উপনিবেশের জনগণকে নতুনভাবে সমস্যায় ফেলে। পাশাপাশি সক্রিয় হয় আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ। এই বাজারু ভাবনার স্বরূপ একটু বুঝে নেওয়া যাক বিনয় ঘোষের ভাবনা থেকে—

> ''ক্রেতাদের মন ভুলিয়ে ফুসলিয়ে মাল বিক্রির জন্য এবং চটকদার মোড়ক প্যাকেজ ও লেবেলের সাহায্যে। মাল যাইহোক তাতে কিছু আসে যায় না, বিক্রি নির্ভর করে মোড়কের আকর্ষণ, প্যাকেজের ডিজাইন ও লেবেলের চমকের উপর। মাল যদি বাজারের শ্রেষ্ঠ মাল হয়, কিন্তু তার মোড়ক ও প্যাকেজ যদি চিত্তাকর্ষক না হয়, তাহলে তা বিকোবার কোনো সম্ভাবনা নেই।''[১২]

এই বাজার চক্রের ফাঁদে অন্যান্য বিত্তিজীবীদের পাশে মধ্যবিত্ত জনমানসও জড়িয়ে যায়।

গ. এই সময় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সাফল্য মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। রাশিয়ার পাশাপাশি চীনেও মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে শুরু হয় চীনের বিপ্লব। পৃথিবীর সর্বত্র বিপ্লবের আঁচ লাগে।

ঘ. ভারতে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আসার সাথে সাথেই দেশভাগের কবলে পড়ে বাস্তুচ্যুত মানুষ বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ঙ. সাধারণ মানুষের সাথে বিপ্লবের সামিল হয় কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি। তেভাগা কৃষক আন্দোলন, তেলেঙ্গানা আন্দোলন, ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা আন্দোলন, সমাজে ঘটে চলা শ্রেণি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে।

চ. শ্রেণি সংগ্রাম বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে, ধনতন্ত্র নির্বাসনের অজুহাতে মার্কস, এঙ্গেলস, স্তালিন, লেনিন, মাও-সে-তুঙ প্রমুখের আদর্শকে বিকৃত করে নৃশংস অভিযান চালায় একদল মানুষ। যার সর্বোচ্চ লক্ষ্য নকশালপন্থী আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে ১৯৬৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে।

সত্তর দশকের আলোচনায় নিবিষ্ট চিত্তে মগ্ন হতে গেলে কোনো প্রকারেই নকশালবাদী রাজনীতিকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তখনকার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উপর সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকবার ওপরও এর প্রভাব পড়েছিল মারাত্মক ভাবে। তৎকালীন পত্র-পত্রিকার দিকে নজর ফেরালেই এর অজস্র প্রমাণ মিলবে। বিশেষ করে পুলিশি সন্ত্রাসবাদ কত যে মায়ের কোল শূন্য করেছে আর স্ত্রীর সিঁদুর কেড়ে নিয়েছে তার হিসেব রাখা হয়নি বলে সেনসাস রিপোর্ট এই স্থানে দেওয়া গেল না। তাও একটু তথ্য পাওয়া যায়, বরানগরে ১৫০ জন সাধারণ যুবকের তাজা রক্তে সেদিনকার আতঙ্কের ইতিহাস রচিত হয়েছে। এই নৃশংস হত্যার শিহরণ সাধারণভাবে বেঁচে থাকা মানুষের বুকের রক্তকে হিম করে দিতে যথেষ্ট বলে মনে হয়। মানুষ হত্যার ষড়যন্ত্রে এই সময়কালে যারা জড়িত ছিল; তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে নয়, আমন্ত্রণ করেছিল আজকের আতঙ্কবাদকে। বিপ্লবের নামে এরা চালিয়েছিল মানবীকতা হননের প্রবল তাণ্ডব। এদেরকে কেন্দ্র করেই নকশালবাদী আন্দোলনের যাবতীয় সুনাম এবং দুর্নামও, যা কিনা সমাজে আজও প্রচলিত।

নকশালবাদী আন্দোলন মধ্যবিত্তের কোল শূন্য করেছিল ঠিক, মুক্তি যুদ্ধও তাই করেছিল। প্রায় সকল প্রকার আন্দোলনই মধ্যবিত্ত সমাজ চেতনার বুকে আঘাত করেছিল।

মধ্যবিত্ত সমাজ কোনো ভাবেই ঘরের সুখি গৃহকোণে দিন বা রাত্রি যাপন করতে পারেনি, কখনো তা ব্যক্তিগত স্বার্থে, আবার কখনো বা সামাজিক চাপে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতেই হয়েছে। এই অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাদের পরিবার তথা সমাজকে অবক্ষয় তথা ভাঙনের সিড়ি তৈরি করে দিয়েছে।

এই সময়কালে ঢাকায় বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী 'মুসলমান সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। চারদিকের ভয়াবহতা তাদের স্থির ভাবে বসে থাকতে দেয় না। তাদের হাতের কলম নিসপিস করতে থাকে। এই সংগঠনের তৃতীয় বার্ষিক সভাতে আমন্ত্রিত ছিলেন কবি জসীমদ্দিন (১৯০৩-১৯৭৬)। আমন্ত্রণ পত্রের সুবাদে প্রত্যুত্তর রূপে তিনি একটি চিঠি লেখেন; চিঠির গুরুত্ব না থাকলেও চিঠির কিছু উক্তি খুবই মূল্যবান হয়ে ওঠে আমার এই আলোচনায় তাই প্রসঙ্গক্রমে তা তুলে দিচ্ছি—

> ''আপনাদের সাহিত্য সমাজকে আমি সাহিত্য সমাজ বলেই ধরি না। মানুষের দুর্দিনের ইতিহাসের পশ্চাতে মানুষের মুক্তির দেবতা শব সাধনা করেন। আজ বহু মুসলিমের সমাজ আঙিনায় শ্মশানের প্রেতযোগিনীর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়েছে। কোন দেবতা আজ এই ঘোর অমানিশার অন্ধকার কুহেলি কুহরে জাতির মুক্তি-মন্ত্র রচনা করছেন তাঁকে আমরা দেখিনি। তবু মনে হয় আপনাদের ভিতর যেন সেই দেবতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। তাঁকে যেন আপনারা চিনেছেন। একদিন আপনাদের আহ্বানে সেই দেবতা এসে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় পীড়নের, দুঃখের, বেদনার মন্দির সাজিয়ে বসে থাকি।''[১৩]

জসীমদ্দিন বাংলাদেশের সাহিত্যের মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সন্দেহ, হতাশা এবং আশাবাদীতার মন্ত্র জপ করেছেন। সত্যি বলতে তাঁর আশাবাদীতার মন্ত্রোচ্চারণ সফল হয়েছিল কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যক্ষ করে যেতে পারেননি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংকীর্ণমনা মানসিকতার পটভূমিতে এসে জীবনের অবক্ষয় দেখানোর পার্শ্বে আশার সঞ্চারও করেছিলেন তাঁর গল্প সাহিত্যে। ইলিয়াস দুঃখ বেদনার মন্দিরে লেখনী হাতে পুরোহিত রূপেই এসেছিলেন

অস্বীকার করার উপায় নেই বললেই চলে।

ইলিয়াস মানুষকে দেখেন সম্ভাবনাময় সৌন্দর্যে, তাকে বিচার করেন দৈশিক ও কালিক প্রেক্ষাপটে। তাঁর এই কাল ভাবনা দ্বন্দ্ব মুখর বিবর্তিত সময় নিয়ে, সেখানে মানুষ প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে। কখনো ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি, কখনো ব্যক্তির সাথে সমষ্টি, কখনো সমাজ নীতির সাথে ব্যক্তি। আর এ সংগ্রামশীলতা একটা সমাজ এবং সে সমাজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র থেকে। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের স্পন্দনশীল, বেঁচে থাকার জন্য তাঁর অপরিমেয় স্বপ্ন, স্বপ্নের মাঝেই তার আশা ও আকাঙক্ষার বাস্তবায়নের চেষ্টা। এই প্রবণতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইলিয়াস সাহেব চরিত্রকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সচেতন পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর সূক্ষ্ম অ্যানাটমিতে আণুবীক্ষণিক যন্ত্রে ধরা পড়ে চরিত্রের ভিতর বাহির। ইলিয়াসের গল্পে দেখানো হয় ব্যক্তির ক্ষয়, ব্যক্তি যে সমাজে-যে বুর্জোয়াবাদের ছায়ায় বেড়ে উঠেছে, সেখানে তার অস্তিত্ব সংকট প্রবল। ব্যক্তি পরিণত হয়েছে ব্যক্তি সর্বস্বতায়; রক্ত শূন্যতায় সে রোগগ্রস্ত। এই রুগ্ন ব্যক্তি স্বার্থ সমৃদ্ধ সমাজ সম্পর্কে তিনি জানান—এই রুগ্ন ব্যক্তিটি কিন্তু স্বয়ম্ভূ নয়, কিংবা বহু পূর্ব-পুরুষের রক্তের স্রোতে এইসব রোগ তার শরীরে উজান বেয়ে আসেনি। বর্ণে ধর্মে ও শ্রেণিতে ছেঁড়া এবং স্টেটস্‌ম্যান রামকৃষ্ণ, ক্ষুদিরাম, মহাত্মা, দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, নজরুল ইসলামের শান্তিপূর্ণ সহাবস্তানে তৃপ্ত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজব্যবস্থা হলো এই ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক। ব্যক্তির রোগের কারণগুলি তিনি পাঠকের সমীপে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন, যাতে করে মধ্যবিত্তের অবক্ষয় পাঠককে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।

ইলিয়াস তাঁর চরিত্রে শ্রেণি ভাবনাকে যৌনতার সঙ্গে জুড়িয়ে দিয়েছেন। একটা ক্ষেত্র বা রেঞ্জ থেকে তা নিয়ন্ত্রিত। ইলিয়াস যাকে বলেন 'standard of living' বা জীবনযাত্রার মাপকাঠি। এ মাপকাঠির বিবেচনায় সে জীবন সঙ্গী বেছে নেয়। কিংবা বিকৃত যৌন লালসা নিঃসঙ্গতার পরিপূরক হিসেবে কামনা করে যৌনসঙ্গী। এই সকল বিষয়গুলি নির্ভর করে মর্যাদা বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সফলতার ওপর। লেখক অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতায় কিংবা অবক্ষয়ী চেতনার আধারে 'মাস্টার বেশন' প্রক্রিয়াকে শিল্প সিদ্ধ করে রূপদান করেছেন তার গল্পে ('অন্য ঘরে অন্য স্বর')। ইলিয়াসের দেওয়া এক সাক্ষাৎকার থেকে তাঁর ভাবনার এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে

"...Society is not free, the society is not even

healty। একটা sick society -তে লোকে masturbate করে। তবে এটা কিন্তু শুধু free sex -এর ব্যাপার না। বহু married লোকেরাও regular musturbate করে। মানে, যে ওই কাজটা করে তার কোনো partner নেই কিংবা যে partner আছে তার সাথে কোনো involvement নেই। তার in his deep inside নিঃসঙ্গতা আছে; সে সব অর্থেই একজন partnerless man। একটা sick society -তে মানুষের এ অবস্থা হয়। আমেরিকার মানুষেরা masturbate করে। আমার তো মনে হয়—কিছু মনে কোরো না—গোরবাচভও এখন musturbate করে; কারণ এখন সে একটা sick society তৈরি করার হোতা।''[১৪]

মানবিক চাহিদা প্রকাশে আখতারুজ্জামান গল্পে যৌনতার কথা বলেছেন কিন্তু এর পাশে তিনি মধ্যবিত্ত সমাজের এক অসাধারণ সুপারিশের রাজনীতিকে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্ত সমাজ ক্ষয়ে যাওয়ার মূলে অর্থনির্ভর, বা ক্ষমতা প্রতিপত্তি নির্ভর সুপারিশ মানব জীবনকে নিঃশেষ করে কীভাবে, তা দেখাতে ভোলেননি। সুপারিশ নির্ভরতা ইলিয়াস সমাজ বুকে ঘটতে দেখেছেন বলেই তাঁর রচনায় তুলে আনতে পেরেছেন। ১৯৬৯, ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই সুপারিশের রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে এবং শান্তি শৃঙ্খলা ইত্যাদির বুলি আউড়িয়ে জনগণকে আন্দোলন থেকে বিরত রাখার দিকে সজাগ দৃষ্টিক্ষেপ করেছিলেন শেখ মুজিব। রাজনৈতিক এই সুপারিশ নীতি ক্রমে মধ্যবিত্ত সমাজের অন্দরমহলে ঘুনপোকার ন্যায় প্রবেশ করে যায়। বুর্জোয়া সমাজ ব্যক্তি নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উচ্চ-নিম্ন, নিম্ন-মধ্য উভয় শ্রেণি সম্প্রদায়ের উপরই সুপারিশের নীতি প্রয়োগ করতে থাকে। সুপারিশ নীতির ফলে কি হতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা যা পাই তা সত্যিই ভাবনার জগৎ বন্ধ করে দেয়—

''জনগণকে সত্যিকার সংগ্রামের থেকে বিরত রেখেই গোপন আলাপ-আলোচনা এবং সুপারিশের পথেই শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী, মোজাফফর আহমদ এবং তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গ দেরকে আজ অগ্রসর হতে হবে, কারণ তাঁরা সকলেই প্রত্যক্ষ

অথবা পরোক্ষভাবে এদেশের বুর্জোয়া, সামন্ত স্বার্থের প্রতিনিধি। এই বুর্জোয়া সামন্ত স্বার্থ এখন সারা পাকিস্তানে, বিশেষতঃ পূর্ব বাঙলায় তাদের বিরোধী শক্তির সাথে নেতৃত্বের জন্যে লড়তে শুরু করেছে। এ লড়াইয়ের ইতিহাস নোতুন, সবেমাত্র তার শুরু। কিন্তু তবু লড়াই শুরু হয়েছে এবং পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনগণকে বিভ্রান্ত করে নেতৃত্ব সামন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে আর বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যাবে না একথা তারা সকলেই আজ সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে। সেদিক দিয়ে তাদের বোঝাবুঝির মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। এবং সেজন্যই তারা এখন নেতৃত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে মরিয়া হয়ে লড়ছে।''[১৫]

ইলিয়াস তাঁর গল্পে সমাজের কোনো অবাস্তব বিষয়কে প্রবেশ করাননি; তিনি মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয় নির্দিষ্ট রূপ রেখায় যে অনুভব করতে পেরেছিলেন তা প্রাগুক্ত মন্তব্যের শেষ লাইনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

এখানে বুর্জোয়া শব্দটির দিকে একটু দৃষ্টি ফেরাবো কারণ স্বরূপ বলে দেওয়া ভালো, এই বুর্জোয়া সমাজই আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজকে আলাদাভাবে চিনিয়েছে। বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গের এমনকি বঙ্গদেশের মানুষ তিনটি বর্গে বিভক্ত—

ক. বুর্জোয়া : বুর্জোয়া যাদের কিনা বলা হয় ধনীক শ্রেণি। অর্থাৎ যারা বিদেশি বুর্জোয়াদের সাথে ঘনিষ্ট সূত্রে সম্পর্কিত। রাজনীতিক পরিভাষায় বা ব্যাখ্যায় যাদের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া হিসেবে পরিচায়িত করা হয়।

খ. পেটি বুর্জোয়া : পেটি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি; এরা স্বল্প পরিমাণে সম্পদের মালিক। আমরা আমাদের আলোচনায় এই শ্রেণি গঠিত মানুষদেরই অবক্ষয়িত রূপের সন্ধান করবো আখতারুজ্জামান ইলয়াসের গল্পে।

গ. সর্বহারা শ্রেণি : সর্বহারা শ্রেণি বলতে আমরা সকলেই বুঝে যাই যে, এই শ্রেণি নিঃস্ব-দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষ।

ধনী ও সর্বহারা শ্রেণির মধ্যবর্তী কাঙারু মাতার থলির বিবরে পেটি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির বসবাস। এই দুই শ্রেণির গোলকের ঠিক মাঝখানে অবস্থান করার ফলে

তাদের জীবন প্রবাহ লিপ্ত হয়ে থাকে 'টানাপোড়েনে'। তাদের প্রধান এবং মুখ্যতম সমস্যা হিসেবে উঠে আসে জীবনের উত্থান অথবা পতন। প্রচুর সম্পদ সংগ্রহকারী বিত্তবান শ্রেণিভুক্ত অথবা সর্বস্ব হারানো শ্রেণিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিণতি আসে। এমনি করে 'দর্শনশাস্ত্রের' অবরোহ এবং আরোহ পদ্ধতির মধ্য দিয়েই চলতে থাকে তাদের জীবন গতি এবং কর্ম প্রবাহ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় আলোচনার পূর্বে আমরা একটু মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর অবস্থান জেনে নিয়ে আলোচনা ক্রমে অগ্রসর করলেই বুঝিবা ভালো হয়—

মধ্যবিত্ত মানবের অবস্থান সাধারণত মধ্যবিত্ত স্তরে। অর্থনৈতিক বিচারে এবং সামাজিক শ্রেণিক্রমে তাদের চলাফেরা সর্বত্র মধ্যম পাণ্ডবের ন্যায় মধ্যম পর্যায়ভুক্ত। মধ্যবিত্ত সম্পর্কে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশ, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডের ধারণা এক নয়। ইউরোপীয় ফ্রান্স প্রদেশে এদের ডাকা হত বুর্জোয়াজি এবং ভারতের দীর্ঘ শাসক দেশ ইংল্যাণ্ডে তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে জ্যামিতিক পরিচয়ে চিহ্নিত করা হত। বঙ্গপ্রদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত সচ্ছল এবং প্রতিপত্তিতে বিত্তবান, তবে আর যাইহোক এদের স্থান সমাজের মধ্যবর্তী স্তরেই রাখা হয়। নিম্নবিত্ত তথা একদিকে শ্রমিক শ্রেণি এবং অপরদিকে উচ্চ যাজক শ্রেণি; ঠিক এদের মাঝের পর্যায়ে অবস্থান নিতে দেখা গেছে পুঁজিপতি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের। ইংল্যাণ্ডেই প্রথম তারা শ্রেণি ক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির তকমা পায়। আর এরা বিত্তবান পুঁজিপতি ও বিত্তহীন কৃষি অথবা শ্রমিক শ্রমজীবী দুই শ্রেণির মাঝের সরলরেখায় নিজস্ব অস্তিত্ব নিয়ে অস্তিত্বশীল হয়ে থাকে। এই অস্তিত্ববান মানব সমাজ আর্থিক ধনীও নয়, দরিদ্রও নয়, এরা ছিলেন পেশাজীবী; শ্রমজীবী নয়। শিল্প বিপ্লবের পর সামাজিক স্তর বিন্যাসে এই শ্রেণি সদস্যদের যে জন্ম হয় তার প্রমাণ মেলে নিচের উদ্ধৃতিতে—

"Between the middle class and the proletariat were
the 'not-so-rich' and 'not-so-poor individuals'

small-shop keepers, governmetal officials, lawers,

doctors independent farmers and teachers."[১৬]

এখানে বলতেই হয়, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজ কাঠামোর বন্ধন জালে আর্থিক থেকে প্রতিপত্তি সম্পন্ন বিত্তবানই ছিল বলা চলে। এর মূল কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে এরা শিল্প মালিক এবং পুঁজিপতি ছিলেন। সময়ক্রমে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান বদলে গেছে এদের সাথে আর শুধুমাত্র শিল্পই যুক্ত থাকেনি যুক্ত হয়েছিল নানান বিষয় ক্রমে তা আলোচনায় আনবো। প্রত্যেক বিষয়ের কোনো না কোনো অন্তিম সীমানা থাকে, তেমনিভাবে মানবের মধ্যবিত্ত শ্রেণিরও সীমানা বর্তমান; আর এই সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে এই সমাজের পেশা এবং আর্থিক সামর্থকে স্পষ্টরূপে অনুভবে আনতে পেরেছি। যদিও তাদের সম্পদ সীমিত তবুও আমরা তাদের জীবন অতিবাহিত করার জন্য এমন জীবিকা গ্রহণ করতে দেখেছি যা শারীরিক শ্রম সম্পৃক্ত নয়, তা মানসিক শ্রম সাপেক্ষ। এই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানব সম্পদ শারীরিক শ্রম থেকে সর্বদা শরীর এবং মুখকে ফিরিয়ে রাখতেই দেখি। এদের সাধারণত পরশ্রমজীবী রূপেই সমাজে দেখা যায়। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কায়িক শ্রমে উপার্জিত তথা অর্জিত অর্থের উপরই তারা নির্ভরশীল থেকেছে। তবে তাই বলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি একেবারেই শ্রমবিরোধী নয়। তারাও সচল এবং তারাও শ্রমদান করে থাকে তবে তা কায়া নির্ভর শারীরিক শ্রম নয়, বুদ্ধিদীপ্ত মানসিক শ্রম। আমাদের আলোচনার মূল ভূমিতে এই অর্থেই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে গ্রহণ করেছি যে, তারা পেশাজীবী; শ্রমজীবী নয়। এই মানবের পেশা আগেই বলেছি একরকম নয়, বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তবে মধ্যবিত্ত স্তরের সমগ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং আচার ব্যবহারে তেমন তারতম্য ঘটতে দেখা যায় না প্রায় এক এবং ভিন্নতাহীন গতানুগতিক জীবন। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের বহমান শিক্ষা ও মনন তাদের একতিয়ার ভুক্ত, উন্নত রুচিবান আবহ এবং সংস্কৃতি চর্চার তারা ধারক ও বাহক রূপে সমাজে বিদ্যমান।

সমাজবিজ্ঞানী আর এইচ. গ্রেটেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা দান করতে গিয়ে জানিয়েছেন—

"মুদ্রা যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক ও প্রাথমিক উপাদান তারাই

মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ।"[১৭]

অর্থাৎ মুদ্রানির্ভর শ্রেণিভুক্ত মানুষই হল মধ্যবিত্ত। যদিও মুদ্রা সমাজের সকল স্তরের মানুষেরই আবশ্যিক মুখ্য কাম্য উপাদান তবুও গ্রেটেন সাহেব মুদ্রা নির্ভর বিশ্ব থেকে কৃষক এবং ভূস্বামীদের মধ্যবিত্তের নির্ধারিত গণ্ডি সীমা থেকে বাদ রেখেছেন। কারণ স্বরূপ দেখিয়েছেন কৃষক ও ভূস্বামীদের প্রধান জীবনাবলম্বন জমিজমা, অনর্থের মূল 'অর্থ' নয়। তিনি মূলত সম্পদভুক্ত বণিক এবং শিল্পপতিদের মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত করেছিলেন। মধ্যবিত্ত বোঝাতে আমাদের দেশে বিত্তকে মানদণ্ড রেখে বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মাঝের স্তরে বসবাসকারি মানুষদের মধ্যবিত্ত বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষিত পেশা নির্ভর এবং বুদ্ধিনির্ভর মানুষদের নিয়েই মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠতে দেখা যায়। একইরকম ভাবে অপর পাশে কেরাণী, কারিগর এবং মজুরদের অর্থগত অবস্থাও প্রায় এক—এ কথা মানতেই হয়। সমাজতত্ত্ববিদ চার্লস বুথ অবশ্য মজুর এবং কেরাণী শ্রেণিকে মধ্যবিত্ত পর্যায়ে কখনোই দেখানোর চেষ্টা করেননি। তাঁর যুক্তি মজুর এবং কেরাণীর আর্থিক ক্ষমতা মধ্যবিত্তের মতো হলেও তাদের জীবন ধারার গতি প্রবাহ আলাদা প্রকৃতির—

> ''মজুরদের থেকে কেরাণীদের জীবনযাপন, চিন্তাধারা ও আদর্শবোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন।''[১৭]

এই সূত্র ধরেই তিনি জানিয়েছেন কেরাণী হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত এবং মজুর ও কারিগর মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজের ময়ূর পুচ্ছ অর্জন করতে পারেনি।

মধ্যবিত্ত সমাজের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে যাবার পূর্বে মোঃ মুস্তাফিজ্জর রহমানের সরল সহজ ভাবনাকে দেখে নেব—

> ''ধনতান্ত্রিক সমাজজাত বিত্তবান ও বিত্তহীন শ্রেণীর মধ্যবর্তী সীমানায় বিচরণশীল প্রত্যক্ষ উৎপাদন সম্পৃক্তহীন, শিক্ষা-সংস্কৃতি-পরিশীলিত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অভিন্ন জনসম্প্রদায়কে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারী-কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, চিকিৎসক, সাংবাদিক-আইনজীবী বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী, প্রশাসনিক কর্মচারী-কর্মকর্তা এবং লেখক, শিল্পী ও রাজনীতিবিদ প্রভৃতি সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত। কোনো ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিক

> মধ্যবিত্ত হিসেবে আমাদের বিবেচ্য নয়, কারণ তারা উচ্চবিত্তের অধিকারী। তবে কোনো শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধিভুক্ত। এক কথায় সাধারণত কায়িক শ্রমহীন, বিদ্যাবুদ্ধি নির্ভর, নির্দিষ্ট রুচি ও সংস্কৃতিবান পেশাজীবী মানুষ নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত।''[১৮]

এখান থেকে আমরা সহজেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে এবং তাদের চিহ্নিত করে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব তা বুঝতে বোধ হয় না আর কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে আমাদেরকে।

ঘর ভাঙার শুরু আদিম গুহা জীবন থেকে। নানান ইতিহাস বদলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সাধারণ মানবজীবনে বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে দেশ ছাড়ার প্রবল ধাক্কা আসে। বাঙালি হিন্দুরা ততদিনে শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙালি মুসলমানদের থেকে অনেক উন্নত অবস্থানে পৌঁছায়। আর তাই তাদের দেশত্যাগের ফলে পূর্ব বাংলায় সাহিত্য সংস্কৃতিতে যে খরা আসে তার দায়ভার পূরণে অন্যান্য লেখক বর্গের মধ্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা মেনে নিতেই হয় আমাদের। ১৯৪৭ সালের পূর্বে কলকাতা অবিভক্ত বাংলার রাজধানী হিসেবেই পরিচিত। এখানে তাই সংস্কৃতি চর্চাও অধিক পরিমাণে হচ্ছিল। '৪৭ -এর পর নতুন রাজধানী 'ঢাকা'। সংস্কৃতি শিল্প চর্চার নতুন পরিবেশ। মধ্যবিত্তের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় অবাধ বিচরণ পটভূমি। সব ভালোর শেষ ভালো নাও হতে পারে। আর ঠিক তেমনিটাই ঘটে, মধ্যবিত্ত অগ্রসর হতে হতে গোবর গাদায় পড়ে যায়, সূচিত হয় তাদের অবক্ষয়।

অবক্ষয়ের প্রথম ধাঁপে দেখা দেয় ব্যক্তি মানুষ। ব্যক্তি মানুষের অবক্ষয়ের দ্বার উৎঘাটনে ইলিয়াসের পাশে আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩) 'নবাব আমীর বাদশাহ' (১৩৪৭) গল্পকে আশ্রয় করে হাজির হয়। মধ্যবিত্ত ব্যক্তি মানুষের অবক্ষয়ের চিত্র তিনি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের চিত্রে। তরুণ যুবকের প্রতিনিয়ত চলে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, তার মেধা আছে, অর্থ জানালা দিয়ে অনেক দিন আগেই পালিয়ে গেছে। আর তাই পড়াশোনার ব্যয় ভার বহন তার নিজের পক্ষে এমনকি পরিবারের পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার এক বন্ধুর সহায়তায় তাকে খুঁজে নিতে হয়

একটি লজিং—

> ''দুই বেলা ভাত ও থাকিবার জায়গা মিলিবে, কর্তব্য কিছুই নয়, তাদের দুই ভাইয়ের তিনটি আর চারটি-সাত, তারপর খুড়তুত ভাইয়ের একটি মেয়ে, দুইটি ছেলে, জেঠতুতোর তিনটি, বড়র একটি শালা, এই মাত্র দুই বেলা পড়াইতে হইবে, আর কিছুই না।''[১৯]

—মধ্যবিত্ত মেধা বিক্রি করে আজ দিন মজুরের মত উচ্চবিত্তের পদসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে দিয়েছে প্রায় বলা চলে। ইলিয়াসের 'কান্না' গল্পে আমরা পরের আলোচনায় দেখতে পাব পুত্রের চাকুরির জন্য পিতার মেহনতির অমানবিক চিত্র কীভাবে উঠে এসেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১) মধ্যবিত্তের ব্যক্তি পরিচয় উদ্‌ঘাটনে 'স্বপ্ন নেবে এসেছিল' (১৩৫০) গল্প রচনা করেছেন। এখানে তিনি ভালোবাসার স্বপ্নে বিভোর ব্যক্তি পরিচয় দেখিয়েছেন। কাহিনিতে আকবরের স্বপ্ন নায়িকা রাবেয়া। আকবর চাকুরে জীবনে সে শান্ত, সুস্থির, আকাঙক্ষা তেমন তার নেই, শুধু অন্তরে সে পোষণ করে রেখেছে লাবণ্যময়ী চাচাতো বোন রাবেয়ার মুখচ্ছবি। সম্পর্কের বাঁধন ছিন্ন করে আকবর শেষ মেষ রাবেয়াকে প্রেম নিবেদন করেই বসে। রাবেয়া ব্যক্তি আকবরের প্রেম বিষয়ে অধঃপতনের রূপ স্পষ্ট করে তোলে—

> ''...আকবরের অন্তর-আবেগ দুর্বার হয়ে উঠল। হঠাৎ হাতটা টেনে তাকে আকর্ষণ করে উত্তেজনাময় কণ্ঠে বললে তোমাকে আমি ভালোবাসি, অত্যন্ত ভালোবাসি। বিমূঢ় রাবেয়ার চোখ দু'টি হঠাৎ একবার লাল হয়ে উঠলো, একবার চোখ নত করে সে আকবরের চোখের পানে সোজাসুজি চেয়ে কিছু কম্পিত অথচ সত্য কথার দৃঢ়তা নিয়ে বললে, ছিঃ, আপনি এত ছোট? রাবেয়া চলে গেল...।''[২০]

ইলিয়াস 'প্রেমের গপ্পো' গল্পে মানব লোকের অন্তর বাসনাকে প্রকাশ করে সুখি গৃহ কোণে কীভাবে সন্দেহের বীজ দানা বাঁধে তার কাহিনি শোনায়, প্রেমের নদীতে কত কিছুই না ঘটে যায়, তার রূপ প্রকাশে ব্যস্ত থেকেছেন তিনি যদিও তা আমরা পরে আলোচনা করবো।

আবুল হুসেন (১৮৯৯-১৯৩৮) 'গোয়ার গাদু' গল্পে মধ্যবিত্তের অন্তরের গভীর কুসংস্কারকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক যুগে বসবাস করার পরও মধ্যবিত্তের গভীর অন্তরে কুসংস্কার কীভাবে বাসা বাঁধে, মানুষের অমানুষ থেকে যে উন্নতি হয়নি তারই চিত্র তুলে ধরে ডাক্তার চরিত্রের বিবেককে গল্পকার প্রকাশ করেছেন। গাদু চরিত্রের অন্তরের অনুভূতিতে কেন ডাক্তার মুচীর চিকিৎসা করে না এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে গাদু কৈশোরে উচ্ছৃঙ্খল থাকলেও যৌবনে এসে নিজের চরিত্রের পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে নিজেকে। গ্রামের মুচী অসুস্থ হয়ে থাকলে সে ছুটে যায় তার কাছে এবং তাকে সুশ্রূশা করতে গিয়েই অস্থির হয়ে ওঠে মানুষের মানবিক জিজ্ঞাসায়—

> ''বিশ্ব পিতার যে জলবায়ু সেবন করিয়া ডাক্তারও মানুষ, মুচীও সেই জলবায়ু সেবন করিয়া মানুষ হইয়াছে। বিশ্বপিতা ডাক্তারকে যতখানি দিতেছেন মুচীকেও ততখানি দিয়াছেন-কাহাকেও কম ও বেশি করেন নাই—তাহার নজরে মুচী ও ডাক্তার সমান। তবে কেন ডাক্তার মুচীকে চিকিৎসা করে না।''[২১]

আমরা এই সকল লেখকদের ন্যায় ইলিয়াসের 'অসুখ-বিসুখ', 'যুগলবন্দী', 'ফোঁড়া', 'অপঘাত' প্রভৃতি সকল গল্পে ব্যক্তি মানুষের অবক্ষয়ের চিত্র সুন্দরভাবে দেখে নেব। ইলিয়াসের গল্প ব্যাখ্যায় না গিয়ে আমরা এখানে ইলিয়াস সমকাল এবং পূর্বকালের এই সকল লেখকবর্গের হাতেও যে ব্যক্তি মানুষের অবক্ষয় চিত্র ধরা পড়েছিল, তারই সুন্দর এক রূপরেখা নির্মাণের জন্য তাঁদের গল্প নিয়ে এখানে দু-চার কথা জানিয়ে রাখলাম মাত্র। আরেকটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো, পূর্ববঙ্গের আরো অন্যান্য লেখকের হাতেও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি মানুষ নানান ভাবে ফুটে উঠেছে অবশ্যই, তবে তা আমাদের এই আলোচনায় বিবেচিত নয় বলে ব্যাখ্যা বা আলোচনায় মনোনিবেশ করতে পারলাম না।

প্রকৃতির জীবনপ্রবাহ সচল রাখতে মানুষ ঘর বাঁধে ক্রমে নিজস্ব প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন গুণ ছড়িয়ে দেয় সন্তানের মধ্যে, সৃষ্টি হয় পরিবার। কখনো ভাতের হাড়ি এক থাকে কখনো দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর মতো বৃহৎ হাড়ি পাঁচ ভাগে ভাগ হয়। অর্থাৎ একান্নবর্তী পরিবার গড়িয়ে 'নিউক্লিয়ার' পরিবারে বিভাজিত হয়। এই বিভাজনই আনে ক্ষয়িত রূপ। মানুষ ক্ষুদ্র পরিবারে সুখী হতে চায়। মধ্যবিত্ত জীবনে পরিবার নিয়ে ভাবনা শুরু হয়ে যায় 'আমি' এবং

'আমার', 'আমাদের' ভাবনা বিকাশ লাভ করে। 'সকল', 'সবাই' ভাবনা অন্ধ নলকূপে মৃত্যুর প্রহর গোনে। ধ্বংস হয় বৃহৎ-এর ভাবনা। ক্ষুদ্রতায় জীবন খুব বেশিদিন এগোতে পারে না, আর পারে না বলেই অবক্ষয় নিরবে নিভৃতে পরিবার জীবনে প্রবেশ করে। এই অবক্ষয় ব্যক্তি মানুষের ভাবনায় এমনিতেই সরাসরি চলে আসে না; সেখানে কখনো সমাজ, কখনো অর্থ গোপনে ছুরি চালিয়ে সরে পরেছে।

ডাঃ লুৎফর রহমানের 'রাজপথ' (১৩৩৭) এবং আবুল মনসুর আহমদের 'মিছিল' (১৯৪৪) গল্পে 'অর্থ' মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনে টেনে এনেছে সংকট, এই সংকটে পরিবারের পরিজনরা বিধ্বস্ত হয়ে মানবিক শক্তি হারিয়ে পক্ষাঘাতের রুগিতে পরিণত হয়েছে। রহমানবাবু তাঁর গল্পে বিধবা সেবা, দাদার মৃত্যুর পর বিধবা বউদি কামিনীকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। রোজগারের ভাড়ার শূন্য, স্বল্প জমি-জমা নিয়ে সংসার চালাতে অপারগ হয়ে যায়। উপায় খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পায় 'বিড়ি শিল্প' কিন্তু পরিবার পূর্ব মর্যাদায় আসীন; তাই সংকল্প ত্যাগ করতে হয়। গোপনে অন্যান্য কাজ ডাল ভাঙা, রশি বানানোর কাজ করে প্রতিবেশি হারানকে দিয়ে তা বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে পাঠাতে থাকে। সংসারের সম্বল দুধেল গাভী ঘটনাক্রমে খোয়াড়ে যায় কিন্তু অনর্থের মূল অর্থের অভাবে তা ছাড়ানো হয় না; নিলামে তা বিক্রি হয়ে যায় বাজারে। সব সওয়া যায় কিন্তু মারণ ক্ষুধাকে কিছুতেই মানানো যায় না; যায় না বলেই অগত্যা দুই বিধবা সেবা আর কামিনীকে নামতে হয় পুরুষের লালসা নিবারণের ব্যবসা তথা দেহ ব্যবসায়।

এদিকে মনসুর আহমেদ 'মিছিল' এ তুলে আনেন দুর্ভিক্ষের নিদারুন বাজার অর্থনীতিকে, এতে করে মানুষের সহ্য ক্ষমতার নিদারুণ চিত্র তিনি গল্প ভূমিতে তুলে ধনের। চাকরিজীবী পরেশদার উপার্জনে সংসার আর চলে না অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধির বাজারে। এই অবস্থায় স্ত্রীর সামান্যতম আবদার মেটানোও পরেশবাবুর পক্ষে হয়ে ওঠে আকাশ কুসুম। সমাজের প্রতি, স্বামীর প্রতি পরেশের স্ত্রীর বিক্ষোভ অন্তরভেদ করে মধ্যবিত্তের পরিবার জীবনে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় আছড়ে পড়ে—

> ''দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরছে সেটা আমার দোষ। আমি কি কারো পেটের ভাত কেড়ে এনেছি? তবে তার জন্য আমায় শাস্তি দেয়া কেন? বাজার আগুন, বাজার আগুন বলে ত

দু'বছরের মধ্যে একসুতো কাপড়ও দাওনি। এই পুজোটাও কি
ফাঁকি দিয়েই নিবে? দাও। কপালে আমার এতও ছিল।''[২২]

আমাদের মুখ্য গল্পকার ইলিয়াস সাহেব 'কান্না', 'দোজখের ওম', 'কীটনাশকের কীর্তি', 'খোঁয়ারি' প্রভৃতি প্রায় সকল গল্পেই মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনের অবক্ষয়িত চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে অন্যান্য লেখক অপেক্ষা তাঁর উপস্থাপন ভঙ্গি মানবের মনে আলাদা মাত্রায় আঘাত করেছে। পরবর্তীতে এই বিষয়ে আমরা পরিসর রেখেছি এই আলোচনায়।

মধ্যবিত্ত জীবনে পরশুরামের কুঠারের ন্যায় সমাজের কুঠার ক্ষমাহীন ভাবে আঘাত হানে; মধ্যবিত্ত মন বিষিয়ে ওঠে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই আঘাতে বহু পরিবার জীবাশ্ম হয়ে গেছে সমাজের শ্রেণিতে। আবুল মনসুর আহমদ 'ধর্মরাজ্য' (১৯৩৫) এবং আবুল ফজল 'লাঠ্যৌষধি' (১৩৪৭) - গল্পে সমাজ বুকের দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘাতের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। নজরুলের (১৮৯৯-১৯৭৮) এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক শরীর হত্যায় নিযুক্ত হয়। কারণ কিছুই নয় পরোক্ষে কাজ করে চলে 'silent killer' 'ধর্ম'। 'ধর্ম রাজ্যে'র একটি মসজিদ এবং 'লাঠ্যৌষধি' গল্পে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার হওয়া শৌচাগারকে কেন্দ্রস্থলে এনে এই দুই সম্প্রদায়ের লড়াইয়ের সূচনাকে তুলে ধরা হয় গল্পের পটভূমিতে। 'ধর্মরাজ্য' গল্পের বিষয় অতি সাধারণ, মুসলমান সম্প্রদায় মুখে চোঙ লাগিয়ে ঘোষণা করে মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো যাবে না। অপর প্রান্তে থাকা হিন্দু সম্প্রদায় এই নিষেধের তোয়াক্কা না করে বাজনা বাজাবে বলে জীবন প্রবাহের নাট্যমঞ্চে তৈরি হতে থাকে। পরিণামে দুই পক্ষে দেখা দেয় ঘটোৎকচের মারণরণ, হিন্দু মরলে সমাজ থেকে পুরস্কার স্বরূপ বীরগাথা উপাধি আর্যবীর এবং মুসলমানের জীবন নাশে শহীদ শিরোপা দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষে যেমন ভাবে রক্ত নদীর ধারা মরুভূমির বালিচর সামান্য সিক্ত করে তেমনিভাবে এই যুদ্ধে বিনষ্ট হয় মানুষের বহু মূল্যবান প্রাণ এবং জীবন নির্বাহনের আবশ্যিক সম্পদ। মধ্যবিত্তের এই সংগ্রামে কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিনিধি শিক্ষিত সমাজের এক বৃহৎ অংশ প্রতিনিধিত্ব এবং যোগদান করে। অতি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিতে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছি—

''অবশেষে হাতের লড়াই থামিল। কিন্তু দাঁতের লড়াই থামিল
না। বাঁশের লড়াই-এর বদলে বাঁশির লড়াই চলিতে লাগিল।

হিন্দু কাগজওয়ালারা মুসলমানদিগকে আর মুসলমান
কাগজওয়ালারা হিন্দুদিগকে প্রাণ ভরিয়া গালি দিতে লাগিল।''[২৩]

অপরদিকে ধৈর্য ধরে থাকা লেখক আবুল ফজল 'লাঠ্যৌষধি'-তে রহিম এবং মুকুন্দ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যারা কিনা একই বাড়ির ভাড়াটে। আর তাই তাদের প্রাতঃকর্মের একই শৌচাগার ব্যবহার করতে হয়। সমস্যা দানা বাঁধে হিন্দুর ব্যবহার করা অশুচি শৌচাগারে মুসলমান যাবে না, মুসলমান ব্যবহার করা শৌচাগারে হিন্দুও ধর্মনাশে যাবে না। এই প্রকারে চলতে থাকায় উভয়ের মধ্যে বিরোধের প্রদীপশিখা বাড়তে থাকে—ইন্ধন যোগানো সংস্কারের তেলে। দু'জন দু'জনকে সহ্য করতে পারে না, অবিলম্বে তারা আপোস আলোচনায় নিজে থেকেই ভরসা হারিয়ে হিংস্রতার পথে সংঘর্ষ বাঁধায়। এই বিরোধে তারা যে মানুষ তা ভুলে যায়। ধর্ম ভিত্তিতে বিভাজিত হওয়া হিন্দু-মুসলমান হিসেবে আঘাত করে উভয়ে উভয়কে। তবে তাদের দু'জনের লড়াইয়ের পিছনে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষই মূলত কাজ করে অলক্ষ্যে।

ইলিয়াস মুক্তি যুদ্ধের প্লটকে গ্রহণ করে সমাজের অবক্ষয় চিত্র তুলে ধরার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায় 'মিলির হাতে স্টেনগান', 'রেইনকোট', 'যুগলবন্দি' প্রভৃতি গল্পে। এই সকল গল্প নিয়ে আমরা আলোচনায় যাব আলোচনার নতুনত্বের সন্ধান করতে।

মধ্যবিত্ত জীবনে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আন্দোলন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকারেই ডেকে আনে অবক্ষয়কে। কোনো প্রয়োজন ছিল না, আবার হয়তো সমাজ, রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন ছিল। তবে যুদ্ধ বলা হোক আর আন্দোলন তা মানব জীবনের স্বাভাবিক অবস্থানের ভিত্তিভূমিকে ভূমিকম্পের ন্যায় দোলা দেবেই। প্রতিবাদ প্রতিরোধ হল জ্বলন্ত জীবন্ত ভিসুভিয়াস। অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবেই, এতে নিজের লেলিহান লাভা সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি সকলকেই পোড়াবে। সমাজ বিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গভীর অনুসন্ধান সাধারণত তাই বলে। মধ্যবিত্ত সমাজের এই রাজনৈতিক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কথা ইলিয়াসের পাশাপাশি যাঁরা শুনিয়েছেন তাদের কথা একটু জেনে নিয়ে আমরা সরাসরি মূল ইলিয়াসের গল্প আলোচনায় চলে যাব। আলাউদ্দিন আল আজাদের 'উত্তাপ' ('অন্ধকারের সিঁড়ি', ১৯৫৮), 'কবি' ('উজান তরঙ্গে', ১৯৬২), শওকত ওসমানের 'বোনবিবির কেচ্ছা' (উভশৃঙ্গ, ১৯৭৫) এবং সরদার জয়েন উদ্‌দীনের 'কারফিউ' (অষ্টপ্রহর, ১৯৭০) প্রভৃতি সকল গল্পেই মানব সমাজের মধ্যম শ্রেণিতে অবস্থানকারিদের স্বার্থ, আত্মত্যাগ, পরোপকার, নিজোপকার, পড়শিপকার -এর কাহিনি

বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনি বর্ণনায় নানান চরিত্র তাদের সুকৃত্রি, দুষ্কৃতির আচ ছড়িয়ে দিয়েছে। তবে এখানে ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ অনেক ব্যাপ্তি পেয়েছে। ভাষা সমস্যার সাথে দেশের সাধারণ মানুষের মেলামেশা বেড়ে গেছে। মুর্তজা বশীর এবং সেলিনা হোসেনের গল্পে একুশের চেতনায় জাগ্রত হয়েছে মানবিক মূল্যবোধ। মানুষ স্বার্থ ভুলে পথে নেমেছে। কিন্তু পাকিস্তানি পৃষ্ঠপোশক মধ্যবিত্তের এই সময় পর্বে অবক্ষয় তারা নিজেরাও আটকাতে পারেনি। না পারার কারণ মহান প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের আগুন পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে ঘর পোড়াতে থাকে। তাই একুশ অমর হয়ে মধ্যবিত্তের নতুন মাত্রা দিয়েছে। আত্মচেতনা এবং আত্মবোধ এই আন্দোলনের পারদকে বাড়িয়ে দেয়, শরীর উষ্ণ হয় প্রতিরোধের ইচ্ছায়। মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে জাগাতে গিয়ে মধ্যবিত্ত নিজের ঘর ছেড়েছে বরণ করেছে মৃত্যু। একুশের মৃত্যু বিষয়ে আমাদের অবিস্মৃত স্মৃতিতে জহির রায়হানের কথা বারে বারেই মনে উঠে আসে। এই হত্যা শুধু হত্যাই, এক পাক্ষিক মধ্যবিত্তকে দমিয়ে রাখা আর সম্ভব হয় না। চুয়ান্ন সালের রাজনৈতিক উত্তাপ, উনসত্তরের গণবিক্ষোভের ঐতিহাসিক পটভূমি, শ্রমিক আন্দোলন, '৫৪-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে যুক্তফ্রন্ট এবং মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের জয়, ফলে মুসলিম লীগের ভয় এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি প্রভৃতি সকল ঘটনাবলীই মধ্যবিত্ত জীবনের উপর নেমে এসেছিল। ইলিয়াস সাহেব 'অপঘাত' গল্পে দু-লাইনে প্রতিবাদ প্রতিরোধের চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—

> ''বিলের ধারে লাশ, বাঁশ ঝাড়ে লাশ, স্কুলের পেছনে লাশ,
> তাইতো একটা মাস যতোগুলো মানুষ পড়লো সব কটা গুলি
> খেয়ে মরেছে। -সব্বাই! তাই তো! -সকলের অপঘাতে মৃত্যু।''[২৪]

মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়িত রূপ সভ্যতা তরুর পুষ্পে কীভাবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে উঠে এসেছে তাঁর স্বরূপ প্রকাশে আমরা এখন নিয়োজিত হব—

মধ্যবিত্ত দাম্পত্য জীবনে অন্তর শূন্য নরনারীর নিঃসঙ্গতা জীবন বোধে কীভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তাকে প্রকাশ্যে আনতে ইলিয়াস সাহেব রচনা করেছেন 'উৎসব' (অন্য ঘরে অন্য স্বর, ১৯৭৬) গল্প। গল্পের অন্দর মহলে লেখক মানুষকে কুকুরের সাথে দাড় করান। বড় লোক বন্ধুর বৌভাতের উৎসবে সুন্দরী মেয়েদের দেখে ঘরে ফেরার পর মূল Tpical মধ্যবিত্ত মানুষ আনোয়ারের কাছে দাম্পত্য মনে হয় কষায় স্বাদ। তাঁর স্যাঁতস্যাঁতে দরিদ্র

ঘরে নিজের স্ত্রী সালেহাকে দেখে বিবেকে কাল নাগিনীর বিষ তুল্য অসংস্কৃত, গেঁয়ো মনে হয়। জীবন সেখানে দোয়েলের, কুকুরের বোধে আক্রান্ত হয়। মানুষের তিনটি অনিবার্য উপাদান 'ক্ষুধা', 'নিদ্রা' ও 'মৈথুন'। 'মৈথুন' অর্থাৎ যৌনজীবন। এই যৌনতার যৌন সঙ্গমে শিৎকার ধ্বনি উৎপন্ন করার ইচ্ছায় বাদ সাধে আনোয়ারের স্ত্রী, আসে তাই বিতৃষ্ণা। যৌন তৃপ্তির জন্য আনোয়ার ছুঁতে চায় বন্ধুর বৌভাতে দেখা সুরুচি সম্পন্ন সুন্দরী নারীদের। কিন্তু তা সমাজ বাঁধনে আত্মমর্যাদার দহনে পূরণ হয় না, মানে সম্ভব হয় না। আর ঠিক সেই পরিবেশ মুহূর্তে রাস্তার মোড়ে কুকুরের রতিক্রিয়া শুরু হয়; এই রতি ক্রিয়াই আনোয়ারকে নিজ স্ত্রীর কাছে উপগত হতে সাহায্য করে। ইলিয়াস সাহেব যৌনতার বিষয়টিকে সামাজিক শ্রেণি নিরপেক্ষ করে দেখেন নি। আর তার প্রমাণ আমরা পূর্বের আলোচনাতেই করেছি। এখানে ইলিয়াসের দৃষ্টিভঙ্গি আরেকটু দেখে নিলে বোধ হয় বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার হবে। ইলিয়াস সাহেব জানিয়েছেন—

> ''Sex কে আমি কখনো glorify করতে চেষ্টা করিনি। আমি Sex -এর পেছনে living মানে class কে দেখতে চাই।''[২৫]

রতিক্রিয়া আনোয়ারকে সঙ্গমে নিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু নিজ স্ত্রীর প্রতি তার অনিহার কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা লেখকের বর্ণনায় জেনেছি—

> ''এই মেয়েটা বছর খানেক হলেও তো কলেজে পড়েছে, বিয়ের আগে এমনকি একটু প্রেম মতোনও করলো অথচ এমন জুবুথুবু হয়ে থাকে কেন? শাড়ির ভেতর বুক নেই পাছা নেই, দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা বেঢপ কোল বালিশ।''[২৬]

এই সকল ভাবনা আনোয়ারকে ক্লান্ত করে, হতাশ করে, জীবনে তৃষ্ণার্ত মরুভূমির বালুচর নিয়ে আসে; এই মুহূর্তে সালেহা কথা বললে আনোয়ারের বিরক্তিকর পৃথিবী আরো বিরক্তিতে ভরে যায়—

> ''কলতলায় দু'টো ইটের ওপর ধ্যাবড়া দু'টো পা রেখে সে গ্যালন খানেক পেচ্ছাব করবে। মেয়ে মানুষের এরকম বারবার পেচ্ছাব পায়খানা করা, দলা দলা থুতু ফেলা —এসব আনোয়ার আলির মনঃপূত নয়।''[২৭]

এই সকল কারণই আনোয়ারকে যেন নিজের মুদ্রাদোষে নিজেকে চারিদিক থেকে আলাদা করে নতুন উৎসব মুখর পরিবেশে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু, হায়, কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে; আর তাই যখন চোখের সামনে—

> ''...গলির মুখে খিজির আলির বাকের আলির দোকানের গা ঘেঁসে, ১টা ল্যাম্পোস্টের নিচে ১টি পুরুষ কুকুর ও ১টি মহিলা কুকুর যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। জনতা কুকুর রতি দ্যাখার উৎসবে মুখর, তারা নানাভাবে কুকুরদের উৎসাহিত করে।''[২৮]

উঠে আসে এই দৃশ্য, ঠিক তখন আনোয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ঘুম ঘুম গলায় তার স্ত্রী বাইরের কোলাহলের কারণ জানতে চাইলে আনোয়ার আলি লোকেদের দেখা কুকুরের মজার এই দৃশ্যের কথা উচ্চারণ করেই শেলী বলে সালেহাকে বুকে টেনে নেয়। এখন আনোয়ারের উৎকৃষ্ট জীবন অন্ধকারের চোরা গলিপথ পেরিয়ে পালিয়ে গেছে, তার হাতের পুরু গ্লাভস্ খসে পড়েছে—

> ''...বিছানায় শুয়ে 'আমার শেলী' বলে আনোয়ার আলি স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলো।... আনোয়ার আলির হাত থেকে রাবারের পুরু গ্লাভস খুলে গেছে। চামড়ার আবরণটাও উঠে যাচ্ছে নাকি? .... সুখ ও উত্তেজনায় আনোয়ার আলির উত্তপ্ত কণ্ঠ থেকে, মুখ থেকে আঠালো ধ্বনি চুঁয়ে পড়ে।''[২৯]

এই মিলিত হবার দৃশ্য আমাদের একটু কাব্যিক করে তোলে-আর তাই আহসান হাবিবের সুরে সুর রেখে বলা যায়—

> ''হে শ্যামল সত্য হও, সুর নয় শরীর ধারণে
> আমাকে মজাও প্রভু, দাও স্পর্শ, ধরো আলিঙ্গন।''[৩০]

ইলিয়াস প্রায় তাঁর প্রতিটি গল্পেই মানবজীবনের সমগ্রতাকে ধরার চেষ্টায় নিযুক্ত থেকেছেন। গল্প চরিত্রদের প্রতি তিনি ছুরি কাচি নয় সূক্ষ্ম সূচ ব্যবহার করেছেন অনুসন্ধানের জন্য। উন্নত হওয়া আমাদের এই সমাজ মানসের বিচিত্র জীবন প্রবাহকে সর্বদা আমাদের সামনে প্রকাশের জন্য ব্যস্ত থাকতেন তিনি। 'উৎসব' গল্প তাই আমাদের চরিত্রের অন্তরে লুকিয়ে থাকা স্বাভাবিক বাস্তবতা, অপেক্ষা অস্বাভাবিক বাস্তবতার নতুন অর্থকে পাঠকের সামনে দেখতে এবং বোঝাতে

সাহায্য করেছে। এই বাস্তবতা অসহনীয় উত্তপ্ত তেলের মতো নির্মম বাস্তবতা। ইলিয়াস প্রসঙ্গে গল্পকার হাসান আজিজুল হকের নিজস্ব সৃষ্ট ভাষায় তাই বলা চলে—

''তাঁর লেখায় হাবা গঙ্গারামের প্রেম নেই।''[৩১]

সমাজের পুরোনো একটা মেশিনকে খুলে পরখ করে নিয়ে যিনি স্বপ্নের ঠিকানা নির্মাণ শুরু করেছিলেন তিনি ইলিয়াস। তেতাল্লিশ থেকে সাতানব্বই ৫৪ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি সমাজের পুরানো মেশিন খুলে দেখে নিয়েছিলেন। এই দর্শনের অনুভূতিতে তাঁর 'হিরো' কলমে উঠে এসেছে- 'তারা বিবির মরদ পোলা' (খোঁয়ারি ১৯৮২)। গল্প বিষয়ে তাই ইলিয়াসকে নিয়ে কোনো কথা হবে না। চমৎকার অনুভূতির প্রকাশ। গল্প ভিতরে পড়তে পড়তে প্রবেশ করলেই তরুণ যুবক গোলজার আমাদের ডেকে নেয়। স্ত্রী সখিনা, ছোট ভাই মহরম আলি, মা তারাবিবি, বাবা রমজান আলিকে ঘিরে তার সংসার। বাড়ি গ্রাম্য কিন্তু বিশাল। গোলজার সখিনা গ্রাম্য হলেও আলাদা ঘরে বাস করে তবে পরিবার একান্নবর্তী। মা তারাবিবি সর্বদা হৈ চৈ নিয়েই সংসারে নিজস্ব দখল দারি প্রকাশে সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখেন। তার দিন রাতের কাজে বানিয়ে বলা, ছোটকে বড় করে দেখানো, বুড়ো স্বামীর ওপর চোখের দ্বারা ভয় ঢোকানোতে সদা জাগ্রত প্রহরি। বয়স তাঁর যুবতী 'পঁচিশ'। মহরম মাইকের দোকানে সকম্পিত আওয়াজ নিয়ে কারবার করে। গোলজার এর স্ত্রীর মন বিশ্বাসে ভরপুর তাই তারাবিবি সখিনার মনে সন্দেহের জিয়ন কাঠি স্পর্শ করিয়ে মনকে সন্দেহবাতিক করে রাখে। গোলজার জীবনে নিত্য দাম্পত্য কলহ, তাই উস্কে ওঠে সখিনার সন্দেহের ডাঙসে। গোলজার বাড়িতে অনুপস্থিত থাকলেই চরিত্র নিয়ে নানান সন্দেহের কাহিনি শুনতে হয়। টায়ার ফাঁটার শব্দ হলেও বুঝি গোলজার বেঁচে যেত কিন্তু আল্লা ভগবান অল্পতেই রেহাই দেবে কেন, নিত্য অশান্তি ভোগ করতে হয় গোলজারকে। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিমন চুরি না করে চুরি অপবাদ শুনতে শুনতে চুরির প্রতি তার মনের লালা ঝড়তে থাকে; তাই না বাড়ির সকলে ফুপাতো বোনের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে গেলে বাড়িতে কেউ থাকে না, বাড়ি এখন ফাঁকা গোলজারের। থাকে শুধু সচেতন সজাগ ঘুম নিয়ে পিতা রমজান, এই সুযোগে গোলজার শূন্য ঘরে কাজের মেয়ে সুজনের মাকে নানা প্রশ্ন করে। সুজনের মা গোলজারের খাবার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে গোলজারের অবসন্ন শরীর গোটা বাড়ির নিস্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে জীবনের অপরাধী সুখ গ্রহণের জন্য সুজনের মার ওপর জমান বাঁধা মিথেন নাইট্রেটের প্রবৃত্তির করাল স্রোত

ঢেলে দেয়। উত্তপ্ত আবহে মিথেন ছড়াতে থাকে এবং নিজেকে জ্বালাতে থাকে। গোলজার নিজের মনের অবদমিত মিথেনকে এই ভাবেই ছড়াতে এবং পোড়াতে থাকে। এমন সময় তারাবিবি কোনো রকম সুযোগ না দিয়েই গোপন হামলার ন্যায় গৃহে প্রবেশ করে এবং পুত্রের অপকীর্তি ঈর্ষান্বিত চোখে দেখে নেয়। অন্যদিকে সচেতন ঘুমের অধিকারী বৃদ্ধ রমজান আলি অসহায়ের মতো ছেলের ওপর তুলোয় ভরা অ্যানাইহিলিয়াম বোমার মতো মুখের বাক্য বোমা ফেলতে থাকে—

> ''ঘরের মইদ্যে গুণা, ঘরের মইদ্যে শয়তানী। নামাজ-বন্দেগী আমাগো ক্যামনে কবুল হয়?.... আমাগো কুনো উন্নতি নাই, — ক্যান? ঘরের মইদ্যে আমাগো শয়তানের কারখানা।''[৩২]

তারাবিবি যুবতী কিন্তু সে তার বৃদ্ধ স্বামীর কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রবৃত্তি নিবারণের প্রয়াস পায় না। এই অবদমিত বাসনা, যখন তার পুত্র গোলজার কাজের লোকের ওপর প্রয়োগ করে পরোক্ষে সে পুত্রকে যেন সমর্থনই করে। এ যেন তার একপ্রকার রোষ মধ্যবিত্ত স্বামীর উপর, তাই সে বয়োঃবৃদ্ধ অথর্ব স্বামীকে তীব্র অনুভূতির রোষ প্রকাশ করে বাক্য বান থামিয়ে দিয়ে বোঝায়—

> ''এমুন চিল্লাচিল্লি করো ক্যালায়? গোলজারে কি করছে? পোলায় আমার জুয়ান মরদ না একখান? তুমি বুইড়া মড়াটা, হান্দাইয়া গেছো কব্বরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা ক্যামনে।''[৩৩]

ইলিয়াসের গল্প বুননের মানসিকতায় মধ্যবিত্তের অবক্ষয় নানান চোরা গলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে নিঃসন্দেহে বলতেই হয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক শহীদ ইকবালের কথা একটু শুনে নেই—

> ''রবীন্দ্রনাথের ' চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে রাজলক্ষ্মীর যেমন পুত্র মহেন্দ্রের জন্য বিনোদিনীকে প্রণোদনা দেন এবং আশার প্রতি ঈর্ষাকাতর হন, তারাবিবির ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও তেমনটা লক্ষ্য করা যায়। তবে ইলিয়াস বর্তমান সময়ে বসে রাজলক্ষ্মীর না-বলা-কথা তারাবিবির বচনে ভীষণ তীব্রতায়

> নির্গত করাতে পেরেছেন। প্রচলিত সমাজ নীতিতে ঔচিত্য ইহবোধ সঞ্জাত লেখকের এ ধারণা নতুন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। এখানে লেখক যতটা সপ্রতিভ ততটাই সাহসী এবং সংস্কার মুক্ত।''[৩৪]

ভরত মুনির নবরসের প্রথম রস 'রতি' প্রথম জীবনে হয়তো বা রতি সংযত পরিবেশে প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা ছিল। কিন্তু বর্তমান সময় কালে নানান পরিবর্তনের পাশে মানবীয় অভ্যন্তরিন রস প্রবাহ কতটা বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে আটকে পরেছে তারই স্বরূপ গল্পকার ইলিয়াস গোলজার পরিবারকে কেন্দ্র করে এখানে তুলে এনেছেন।

> ''এতকাল সাহিত্যে দাপট দেখিয়েছে প্রেম, ভালবাসা, মায়া-মমতা, বিশ্বাস, আস্থা এক কথায় যাকে বলে মানবিকতা। ... এগুলিকে সাহিত্যে পূজা করাই কি লেখকদের একমাত্র কাজ?... নিষ্ঠুরতা, আক্রোশ, বিবমিষা কিংবা তীব্র ঘৃণাই বা সমান গুরুত্ব পাবে না কেন?... এগুলির উপর মূল্যবোধ আরোপ করতে লেখক বাধ্য নন। ইলিয়াসের লেখায় মানবিকতার এই ব্যাখ্যা প্রায় একটি তত্ত্বের রূপ নিয়েছে।''[৩৫]

হাসান আজিজুলের এই মন্তব্য যুক্তিপূর্ণ, কার্য কারণ বদ্ধ আইসোটেপের বন্ধন জালে যে আবদ্ধ তার গুণমুগ্ধ ব্যাখ্যা আমরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'কীটনাশকের কীর্তি' ('দোজখের ওম', ১৯৮৯) গল্পে পাই। বোন আতি মুন্নেসার মৃত্যু প্রবাসী রমিজের মনে প্রাথমিক বেদনাদায়ক ভাবাবেগের জন্ম দেয়। রমিজ বাঁচার তাগিদে পরিবারকে বাঁচানোর সংকল্পে ধনাঢ্য বাড়িতে ফরমাস খাটে মানে টুকিটাকি কাজ করে দেয়, যাতে করে সে তার পরিবার বাঁচাতে সক্ষম হয়। কিন্তু মাঝে চিঠিতে খবর আসে তার বোন আতিমুন্নেসা কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ধনাঢ্য মালিক পক্ষের সোনামিয়ার ব্যঙ্গ মিশ্রিত কষায়ে বক্তব্যে রমিজ বুঝতে পারে বোনের মৃত্যুর জন্য দায়ী মৃধা বাড়ির ম্যাট্রিক পাশ। কিন্তু পরোক্ষণেই মনে হয়, তার বোনও কী এই মৃত্যুর জন্য কম দায়ী! অতীত স্মৃতি রমিজের ভাবান্তর ঘটায় এবং চোখের সামনে ভেসে ওঠে রমিজ যখন বাড়িতে ছিল তখন তার বুবু ম্যাট্রিক পাশের সঙ্গে মৃধাদের বাড়িতে হেসে হেসে নানান কথা বলতো; তখন মায়ে ব্যস্ততায় বুবুকে ডাকতো

সেই ডাক বুবুর কান পর্যন্ত পৌঁছতো না বা পৌঁছলেও বুবুর কোনো ভাবের রাজ্যে বিঘ্ন ঘটত না। বুবু মার ডাক উপেক্ষা করে সরস জমালো জমে ওঠা গল্প থেকে বিরতি দিত না। রমিজের পিতার পাট ক্ষেত বন্ধক পরে মৃধাবাড়ির কিসমত মৃধার কাছে। চেতনা প্রবাহে এই সব খাপছাড়া কাহিনিগুলো যেন রমিজের সিদ্ধান্তের কোনো সূত্র যোজন করে বসে, যখন সোনামিয়া বলে—

> ''গেরাইম্যা মাগীগো আমার বহুত চিনা আছে, বুঝলি? টিরিপ লইয়া আরিচা নগরবাড়ি দুইদিন তিনদিন কইরা থাকি না? ক, থাকি না? দুইটা ট্যাকা দিয়া পাটের খ্যাতের মইদ্যে লইয়া খানকিগুলিরে খালি ঠাপাও, খালি ঠাপাও!''[৩৬]

রমিজের অবিশ্বাস আজ সোনামিয়ার কথা শুনে যেন বিশ্বাসে পরিণত হতে থাকে—

> ''কে জানে সোনামিয়া হয়তো ঠিকই বলছে, অসিমুন্নেসাকে নষ্ট করার জন্য কাজটি মিরধাবাড়ির ম্যাট্রিক পাস বোধ হয় পাট খেতেই সম্পন্ন করেছিল। রমিজদের ঘরের ভিটার লাগোয়া কাঁঠাল তলার জমিতে এবার পাটও হয়েছিলো খুব ভালো।... রমিজের বাপের হাতে ঐ জমিতে পাট যা হয় দূর থেকে মনে হয় যেন সবুজ ঘাসের পাঁজা। বুবুকে নিয়ে ম্যাট্রিক পাস চলে গিয়েছিলো সেই মেঘের আড়ালে। মগরেবের আজানের ঠিক আগে আগে ওরা ওখানে ঢোকে, জায়গাটা সাফ করে নিতে নিতে আজান শুরু হয়। তারপর ঠাসবুনুনি পাটখেত ছেঁকে-আসা আজানরে ঝাপসা শাসন এবং আজানে পাল খাটিয়ে আসা থিকথিকে অন্ধকারে নোয়ানো পাট গাছের ওপর শুয়ে থাকে আসিমুন্নেসা খাতুন। শেকড় বাকড় শুদ্ধ উপড়ে তোলা কাঁঠাল গাছের লুপ্ত ছায়ায় শুয়ে রয়েছে আসিমুন্নেসা, চিৎ পটাং শোয়া। তার সারা গায়ে কোনো জামা কাপড় নেই। লজ্জা শরমের বালাই নাই, বেহায়া বেশরম বোনের গলা টিপে ধরার জন্য রমিজের আঙুলগুলো নিসপিস করে।''[৩৭]

এই মৃত্যু রমিজের মনে 'স্যাডিস্ট' মনোবৃত্তির উৎসকে বাড়িয়ে তোলে। বোনকে গলা টিপে মারার জন্য শরীরের সমস্ত রক্ত ফুটে ওঠে। ফল হয় অন্য প্রকার, রমিজ এই দমিত বাসনা সাহেবের মেয়ের ওপর প্রয়োগ করতে চায়, যার দরুণ কীটনাশক নিয়ে রমিজ সাহেবের মেয়ের পিছনে ধাওয়া করে। মূলত 'Pscyho Sexual Disorder' থেকেই প্রতিশোধ বাসনা সমক্ষে চলে আসে। এই বিকৃত চেতনায় সামাজিক অবস্থানকে ইলিয়াস সামাজিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে প্রকাশের সর্বাঙ্গিন চেষ্টা করেছেন। প্রচলিত অনুকূল সংস্কার প্রবাহকে এড়িয়ে আমাদের লেখক ইলিয়াস সাহেব মোহহীন দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টা তাকে সমকাল, পূর্বকালের লেখক থেকে ভিন্ন ভাব উদ্‌গাতার মর্যাদা দান করেছে।

যিনি গদ্য লেখার জন্য নিজের রক্তপাত ঘটিয়েছেন তিনি ইলিয়াস। সমস্ত রঙিন চশমা ভাবুকদের যিনি দান করেছেন তিনি ইলিয়াস। বাস্তব ক্যামেরা শুধু বাহ্যিক রূপাবয়বের ছবি ফোটায় কিন্তু ইলিয়াস বাহ্যিক অভ্যন্তরিন উভয়ের প্রকৃতিস্থ এবং ব্যঞ্জিত দু'প্রকারেরই ছবি তুলেছেন তার কলমের ক্যামেরায়। তাঁর শৈল্পিক মনের কলম ক্যামেরা তাই অক্ষর পিঁপড়ের ছবি তুলে 'যোগাযোগ' ঘটিয়েছেন আমাদের সঙ্গে। 'যোগাযোগ' ('অন্য ঘরে অন্য স্বর', ১৯৭৬) মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনের জীবন সংকটের কাহিনি এনেছে, এখানে অপত্য স্নেহের, নতুন মাত্রা প্রকাশের চেষ্টা পেয়েছেন। গল্পের শুরুতেই চমক ভাঙা ডাক—

> ''রোকেয়া, অরোকেয়া, আর কতো ঘুমাইবি? কাইন্দা কাইন্দা পোলায় তর শ্বাস বন্ধ হয়। উঠিল? আরোকেয়া।' খোকনের একটানা কান্নার সঙ্গে মায়ের ডাক শুনে রোকেয়ার স্বপ্ন ও ঘুম ছিঁড়ে বড়ো এলোমেলো হয়ে গেল। হায়রে কি কাল ঘুমেই না পাইছিলো আমারে। পোলায় না জানি কখন থাইকা কান্দে।''[৩৮]

ছেলের জ্বরের খবর শুনে জ্বরের পরিমাপ জানতে চায় রোকেয়া, কিন্তু—

> ''১০৪° জ্বর খোকনের শরীরে কম্বলের মতো বিছানো, রোকেয়ার আঙ্গুল এই কম্বল ভেদ করে কি করে খোকনকে ঠিক ঠিক স্পর্শ করে?... খোকনের গোঙানি এখন খুব স্পষ্ট।... খোকনের এখন চোখ মুখ লাল, লাল রঙের বোবা চোখে সে শাদা রঙের শূন্য দেওয়াল দেখছে।''[৩৯]

গল্প বা গল্পের কাহিনি ব্যাখ্যা বিষয়ে অন্য কেউ নয় লেখক ইলিয়াস সাহেবই নিজে উপস্থাপন করে পাঠক সমাজকে জানিয়েছিলেন—

> ''যোগাযোগ গল্পটায় Motherhood তো আছেই, আমি আরও একটি ব্যাপার ধরতে চাচ্ছিলাম। আমি বলতে চাচ্ছিলাম একজন মা with her all affection, Motherhood, বাৎসল্য একটা পর্যায় সব কষ্ট লাঘব করতে পারে না। ... ছেলে যখন বড় হতে থাকে তখন মায়ের সাথে এক পর্যায়ে আর যোগাযোগ ঘটে না। তুমি তোমার Problem আর Share করতে পারছো না। হয়তো তোমার প্রেমের সমস্যা বা কোন Philosophical Crisis, দু'জনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা হয় না, দু'জনের জন্যেই খুব বেদনাদায়ক। তবু এটাই সত্য।''[৪০]

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এমন কিছুই প্রজন্মের জন্ম দেয়। সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের ব্যক্তিগুলিও হয়ে ওঠে পৃথক দুর্বোধ্য, স্বাভাবিক বোধের আগম পারের কিনাড়ায় অবস্থান করছে।

> ''ব্যক্তির সংগে ব্যক্তি, নিজের সংগে নিজের, সমাজের, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংগে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব সংঘাতের কথকতা নিয়ে আখতারুজ্জামানের গল্প।''[৪১]

পুরানো এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যবিত্ত ভাবনায় কতটা অবক্ষয় সূচিত হয়েছে, পুরানো ঢাকার মানুষ ইলয়াস পুরানো ঢাকাকে কেন্দ্র করে তা প্রকাশের অভিপ্রায় নিয়ে রচনা করেছেন 'ফেরারী' ('অন্য ঘরে অন্য স্বর', ১৯৭৬)। গল্পে মধ্যবিত্তের স্মৃতিচারিতার অতীত সুখানুভূতির কথা জানতে এবং বুঝতে এবং বোঝাতে ইলিয়াসের এই গল্পের দ্বারে কড়া নাড়তেই হয় আমাদের। মৃত্যু পথ যাত্রী ওস্তাগরের স্বজনদের সেবা-শুশ্রূষা, ধর্মবোধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সাথে যুক্ত হয়েছে বাইরের সমাজ পরিবেশের 'ভাইরাস এফেকটেট' রক্ত প্রবাহ। আর তাই না স্মরণাপন্ন ওস্তাগরের Psycho Disorder -এর মধ্য দিয়ে সৃষ্ট ইল্যুশন-হ্যালুসিনেশনের মাঝে বেরিয়ে পড়েছে অতীত স্মৃতিতাড়িত ঘটনা; এই ঘটনা বহুলতায় উঠে এসেছে পুরানো ঢাকার নানান দৃশ্যমান জাগতিক বস্তুর চেহারা। দুই প্রজন্মের gap কে লেখক যেভাবে

দেখিয়েছেন—

> ''বন্ধুর ওপর আমীর আলি বেশ চটা, 'তর বাপেরে আমি জিন্দেগীতে নামাজটা ধরাইতে পারলাম না। খালি বায়োস্কোপ দেখছে, খালি বায়োস্কোপ দেখছে। ঘোড়ার গাড়ি চালাইতো আর বায়োস্কোপ দেখতো। ওস্তাগরি করলো বহুতদিন, তহনো ভি চানাস পাইলে লায়নের মইদ্যে ফুল সিরিয়াল মারছে।''[৪২]

ধর্মকে আকড়ে ধরে ধর্মবিশ্বাসে সৎপথে যে মধ্যবিত্ত জীবন শুরু হয়েছিল, সমাজ পরিবর্তনে ধর্ম আজ অন্ধকার ঘরে বসে নিরবে অশ্রুবর্ষণ করে চলে। আর মধ্যবিত্ত মন এখন আলো জ্বালিয়ে বায়োস্কোপ আর সিরিয়াল নিয়ে বসে উচ্চ কণ্ঠে ধর্মকে শাসনে ব্যস্ত। দোয়েলের, শালিকের এক ঘেয়ে জীবন নির্বাসিত, মানুষ মানবিক অবক্ষয়ে সকল সম্পর্ক ভেঙে দিতে এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

'খোঁয়ারি' ('খোঁয়ারি', ১৯৮২) মদ্যপানের এক আসরকে কেন্দ্র করে সমাজ রাজনীতির চাপের মুখে মধ্যবিত্ত সমাজের ভেঙ্গে পড়ার কাহিনিকে পাথেয় করে ইলিয়াস বিনুনি বেঁধেছেন গল্পের। তিনি মদ্যপানের আনন্ত বিষাদ এখানে দেখাননি। উর্দুভাষী ইফতিখারের অসহায় অবস্থানকে ধীরে ধীরে যবনিকা উত্তোলনের মতো করে গল্পের চারিদিকে তুলে ধরেছেন। তার বাড়ি এখন আর তার বাড়ি নেই, প্রায় বলা চলে। সমরজিতের পুরোনো বাড়িতে রাজনৈতিক দলের ইয়ুথ-ফ্রন্টের অফিস খোলার অপরিহার্য চক্রের মুখে সমরজিতের আজ অসহায় সমর্পণ। রাজনৈতিক উত্তেজনায় মধ্যবিত্তের শরীর আজ ঘর ছাড়ছে। নতুন সমাজ তাকে দখল করার জন্য ঊর্ণনাভ রচনা করছে অষ্টপদীরা। কিন্তু তারপরও ক্ষয়িত মানসিকতা নিয়ে সমরজিতের বৃদ্ধ বাবা অমৃতলাল পূর্ব-পুরুষের আত্মশ্লাঘা নিয়ে পুরোনো বাড়িতে অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও বসবাস করে যাচ্ছে। এই সিড়ির লাগায়া ঘরে চির ধরেছে ক'দিন থেকে এই বর্ণনায় আমরা শুধু বাড়ির অন্তরের চির নয় মধ্যবিত্তের হৃদয়েও যে চির ধরে গেছে তার বাস্তবিক চেহারাকে চোখে দেখতে পাই।

প্রভাবশালীরা আজ সমাজে প্রভাব বিস্তার করে বসেছে। তাই সমরজিত নিজের ঘরের বারান্দায় ইজি চেয়ার পেতে সাত পাঁচ ভাবতে বসে। আজ তার চোখে একেবারে খট্‌খটে শূন্যতা দৃশ্যমান হয়। সেখানে একটু ধোঁয়া কি কোনো রঙিন পর্দা কি এমনি ব্ল্যাক

এণ্ড হোয়াইট ছবি কিছুই দ্যাখা যায় না, শুধুই শূন্যতা।

> ''সমরজিতের পাশে গাঁজা গাছের ঝাঁঝরা পাতা থেকে গড়িয়ে পড়ে নেশাগ্রস্ত পোকামাকড় হেঁটে বেড়াচ্ছে পা টিপে টিপে। তাদের টলোমলো পদক্ষেপ ও এলোমেলো পদধ্বনির ভেতর দিয়ে উঁকি দেওয়া 'মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী' কি 'যদি দিতে এলে ফুল হে প্রিয়' তার কানের পর্দায় পাঁচড়ার মতো চুলকাতে শুরু করলে ইজি চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়া ছাড়া সমরজিৎ আর কি করতে পারে?''[৪৩]

শেষ বাক্যে লেখকের প্রশ্ন মধ্যবিত্তের অবক্ষয়ের রাজ্যে তোলপাড় করে যে উত্তর ধ্বনিত করে তা সত্যিকারে আমাদের মেনে নিতেই হয় যে, আজ মধ্যবিত্তের দুর্দিনের প্রদীপ তেল সংযোগে সমাজে আলো ছড়িয়ে জানান দিচ্ছে অবক্ষয়ের।

'পিতৃবিয়োগ' ('খোঁয়ারি', ১৯৮২) গল্পটিতে আশরাফ আলী ও তার ছেলে ইয়াকুবের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক থাকলেও যোগাযোগহীনতা তাদের করে তুলেছে অচেনা দূরের মানুষ। আশরাফ আলীর 'গম্ভীর ও শীতল' মুখ এবং পোস্টকার্ড ভর্তি পিঁপড়ের সারির মতো গুটি গুটি অক্ষরে উপদেশ ইয়াকুবের মনে যে পিতৃছবি গড়ে তুলেছে তা ভেঙ্গে যায় পিতার মৃত্যুর পর, তার পিতা সম্পর্কে অন্যদের ব্যক্ত অভিজ্ঞতায়। আশরাফ আলী সেখানে হাজির হয় 'হাসিখুসি' মানুষ হিসেবে। 'পিতৃবিয়োগ' গল্পে পিতার মৃত্যুর পর পিতা পুত্রের নব-যোগাযোগ ঘটে পিতার পরিচিত লোকজনদের মাধ্যমে।

> ''ইয়াকুব বেশ ঝামেলায় পড়ে, তার মাথার গাঁথুনি শিথিল হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। ছবিতে স্মৃতিতে, চোখে ঠোঁটে চিবুকে, প্রোফাইলে প্রোট্রেটে আশরাফ আলিকে যেভাবে সে গড়ে তোলে, এইসব সংলাপের তোড়ে সবই দারুণ রকম টাল খায়।''[৪৪]

পরিবেশ পরিস্থিতির চিরন্তন সম্পর্ককেও আলো-আঁধারি অস্পষ্ট ছায়ায় দাঁড় করিয়ে ইলিয়াস শৈল্পিক নিপুণ্যে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বাস্তবিক সম্পর্ক মৃত্যুর পর কীভাবে মধ্যবিত্ত মনোলোকে কম্পন তোলে তার যথার্থ চিত্র ইলিয়াস কলমের সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে খাতার পৃষ্ঠায়, বইয়ের পাতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। হয়তো আমরা ভাবি না এসব কিছুই কিন্তু

ইলিয়াস আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছেন তাঁর এই গল্পে।

প্রায় একইরকম বিষয়ের অবতারণা করেছেন 'অসুখ-বিসুখ' ('খোঁয়ারি', ১৯৮২) গল্পে। ব্যক্তির প্রয়োজন, সুখ আরাম আয়েশ তার আদি সম্পর্ককেও অর্থহীন করে তোলে। পিতা-পুত্র, পিতা-মাতার যে চিরন্তন সম্পর্ক দিয়ে সামাজিক মানুষের গদগদ ভাব তার অন্তঃসার শূন্যতা, নির্মমতাকে ইলিয়াস মানব মাধুরি মিশিয়ে কল্পনা করে বোনেন নি বাস্তবের অঙ্গণে বাস্তবিক জীবনকে একপ্রকার খুলেই দেখিয়েছেন।

'প্রেমের গপ্পো' ('জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল', ১৯৯৭) গল্পে জীবনের অপ্রাপ্তিকে গল্পের বুলা এবং জাহাঙ্গীরের কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন গল্পকার ইলিয়াস। প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে অপ্রাপ্তি পূরণের মানসিক বৈকল্যই প্রধান হয়েছে। মিথ্যা মরীচিকার সাহায্যে সাজানো জীবন, মধ্যবিত্তীয় হীন প্রচেষ্টাকে ঝাঁটাপেটা করেছেন এখানে। স্ত্রী বর্তমান থাকতেও অস্ফুটো জাহাঙ্গীরের কণ্ঠে শোনা যায়—

> ''না, পুলিশ বক্সের সামনে দাঁড়িয়ে লাভ কি? মেয়েটার নামটাও যদি মনে রাখত! তবে? সুতরাং ভেস্পার চাকাজোড়া তার কেবল গড়িয়েই চলে।''[৪৫]

এভাবে আধুনিক ভোগবাদের ফলে মধ্যবিত্ত অভাব আর কিছুতেই মিটছে না। প্রাচীনের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের কারণে আজ সমাজ চলে না, চলে শুধু ভোগের আকাঙক্ষাই। এটাই তাদের উন্নতির উপায়, ফলে পরিবেশ আর মানুষের মধ্যে অথবা মানুষ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক প্রেমের সম্পর্ক ব্যহত হয়। বৃদ্ধি পায় প্রতিদ্বান্দ্বিকতা। একের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার প্রবণতা। পুরোনো যুগে সেটি ছিল রাজায় রাজায় কিন্তু এখনকার সমাজ ব্যবস্থায় 'আমরা সবাই রাজা'- ফলে চাকুরি, সরকারি শাসনকার্যে নেতৃত্ব নিয়ে নতুন রাজ্যের দাবি নিয়েও চলে প্রতিদ্বান্দ্বিকতার লড়াই। যেখানে নেতৃত্ব দেয় এই মধ্যবিত্তই। ভোগের কামনায় নৈতিকতা হয় ধূলিসাৎ। পারিবারিক বন্ধন হয় শিথিল। সেজন্য ওসমান ('প্রতিশোধ') ও তার পরিবারকে হাত মেলাতে হয় আবুল হাশেমের সাথে। যাকে কিনা সন্দেহ করা হয় নিজের পরিবারের মেয়ের হত্যাকারী রূপে। ইলিয়াস নিজের গল্পে সুন্দর ভাবে দেখায়, মেয়ের মৃত্যুশোক বেড়ে যায় যখন আবুল হাশেম মেয়ের নামে লেখা বাড়িটা ওসমানের বাবা আবদুল গনির কাছে চাইতে আসে, আবুল হাশেম তখন হয়ে পড়ে খারাপ চরিত্রের

অধিকারী। তাকে অপমান করেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, আবার আনিসের টেণ্ডার পাইয়ে দিতে পারে হাশেমই; তখন আবার তাকে ডেকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থগুলি যে পারিবারিক সম্পর্কগুলিকেও দেখনদারির পর্যায়ে নামিয়ে দেয় তা লেখক খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের সামনে।

'যুগলবন্দি' ('দুধভাতে উৎপাত', ১৯৮৫) গল্পে লেখক দেখান মধ্যবিত্ত জীবন নিজের স্বার্থে প্রভুর মনোরঞ্জনে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে 'আসগর' ও 'আরগস' (বাড়ির মালিকের কুকুর) এক হয়ে যায়। ব্যক্তি স্বার্থে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের হত্যা। আসগরের মাধ্যমে ইলিয়াস মধ্যবিত্ত জীবন কথার ক্ষয়িত কর্কট রোগের অনুসন্ধান দান করেছেন আলোচ্য গল্পের মাধ্যমে।

এই ভাবে ইলিয়াসের গল্পের জমিন জুড়ে আছে ব্যক্তির অন্তর্জাত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা আর বিষণ্ণতা, সামাজিক বঞ্চনা ও বৈষম্যের কারণে ব্যক্তি সংকট ও এর বিপরীত ব্যক্তির দ্রোহ। সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের বাস্তবিক বাস্তবতাকে ইলিয়াস তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন নিজস্ব শিল্প প্রকরণের 'টেকনিক' নির্মাণ করে। ইলিয়াসের নিজস্ব এই প্রকরণ টেকনিকে রয়েছে ঝাঁঝ, শ্লেষ, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, স্বপ্ন, মনোলগধর্মীতা, অসাধারণ ভাষা আর ডিটেইলস। ইলিয়াসের শ্লেষ বড় নির্দয়, তীক্ষ্ণ ফলার মতো, সোজা গিয়ে বিঁধে হৃদয়ে। বাঙালি মধ্যবিত্ত অবক্ষয়গুলি দেখালেও এই পরিবেশ আটকে থাকে না শুধু বাংলাদেশে, ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র, মধ্যবিত্তের অন্তর্লীন সমস্যা নিয়ে।

তথ্যসূত্র :

১. হাবীব আহসান : 'কবিতাসমগ্র' 'ছহি জঙ্গেনামা', অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ১০৯।

২. ইকবাল শহীদ : 'কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস', 'জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন', ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ. ১৩।

৩. মাহমুদ আল : 'কবিতাসমগ্র' 'ঝড়শেষে', অনন্যা, ঢাকা,

পঞ্চম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১৯৮।

৪. প্রাগুক্ত, : পৃ. ৩০৭।

৫. হাবীব আহসান : 'কবিতাসমগ্র', প্রাগুক্ত, ভূমিকাংশ, পৃ. ২৪।

৬. চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম : 'দ্বিজাতি তত্ত্বের সত্য মিথ্যা', 'বাঙালি ও বাংলাদেশ' (বাংলাদেশের প্রবন্ধ সংকলন), অরুণ সেন, আবুল হাসনাত সম্পাদিত, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৫।

৭. রায় অন্নদাশঙ্কর : 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' 'হিন্দু-মুসলমান', বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫, সংস্করণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪, পৃ. ২১৮।

৮. মোমেন আবুল : 'মধ্যবিত্ত : ভাসমান, শৌখিন, ক্ষয়িষ্ণু', 'বাঙালি ও বাংলাদেশ', অরুণ সেন ও আবুল হাসানত সম্পাদিত, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ২০০।

৯. প্রাগুক্ত, : পৃ. ২০০-২০৩।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ : 'ছোটগল্প : নবনিরীক্ষা', প্রথম গ্রন্থ প্রকাশক, অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত, ১৩৭২, পৃ. ১।

১১. চক্রবর্তী সুমিতা, দাশগুপ্ত রণেশ সম্পাদিত : 'সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ', কালিকলম, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩, পৃ. ১১৮।

১২. ঘোষ বিনয় : 'মেট্রোপলিটন মন. মধ্যবিত্ত. বিদ্রোহ', ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৮৯।

১৩. হাসান মইনুল : 'আধুনিকতা ও বাংলার মুসলমান সমাজ', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৭, পৃ. ১৯-২০।

১৪. লিরিক সংখ্যা 'জীবনের জঙ্গমতা : 'লেখকের উপনিবেশ', ৮ বৈশাখ, ১৩৯৯,

এপ্রিল, ১৯৯২, পৃ. ৫২।

১৫. উমর বদরুদ্দীন : 'যুদ্ধ পূর্ব বাঙলাদেশ', মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৭৬, পৃ. ১২১-২২।

১৬. Bank Wall, T, Walter & Tylor, Alastair M : 'Civilization : Past and Present', Vol. 2, Chicago Scott, Foresman and Company, 1949, p. 174.

১৭. ঘোষ বিনয় : 'বাংলার নব জাগৃতি' (চালর্স বুথের বক্তব্য), ওরিয়েন্ট লংম্যান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯১, পৃ. ৬৪-৬৫।

১৮. রহমান মোঃ মুস্তাফিজুর : 'বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৯, পৃ. ২।

১৯. ফজল আবুল : 'রচনাবলী - ২য় খণ্ড', 'মাটির পৃথিবী', 'নবাব আমীর বাদশাহ', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রকাশ ১৯৯৫, পৃ. ১০০-১০১।

২০. ওয়ালী উল্লাহ সৈয়দ : 'রচনাবলী ২য় খণ্ড', 'স্বপ্ন নেবে এসেছিল', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃ. ২৬৩।

২১. হুসেন আবুল : 'রচনাবলী ১ম খণ্ড', 'গোয়ার গাদু', অনন্যা, ঢাকা, প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৩৩৬।

২২. আহমেদ আব্দুল মনসুর : 'মিছিল', 'ফুডকনফারেন্স', মুক্তধারা, ঢাকা, প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ১১৩।

২৩. আহমেদ আবুল মনসুর : 'গল্পসমগ্র', 'ধর্মরাজ্য', 'আয়না', মুক্তধারা, ঢাকা, প্রকাশ ১৯৮৭, পৃ. ১৬৮।

২৪. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রচনাসমগ্র ১ম খণ্ড', 'অপঘাত', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ২৭৪।

২৫. ইলিয়াস শাহদুজ্জামান : 'জীবনের জঙ্গমতা : লেখকের উপনিবেশ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস', জুন, ২০০৫, পৃ. ৪৯।

২৬. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রচনাসমগ্র-১', 'উৎসব', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ২৩।

২৭. প্রাগুক্ত, : পৃ. ২৩।

২৮. প্রাগুক্ত, : পৃ. ২৯।

২৯. প্রাগুক্ত, : পৃ. ৩২।

৩০. মাহমুদ আল : 'কৃষ্ণকীর্তন', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৩১. হক হাসান আজিজুল : 'কথাসাহিত্যের কথকতা', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃ. ৭৫।

৩২. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'রচনা সমগ্র - ১', 'তারাবিবির মরদ পোলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

৩৩. প্রাগুক্ত, : পৃ. ১৪৭।

৩৪. ইকবাল শহীদ : 'কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৩৫. হক হাসান আজিজুল : 'কথাসাহিত্যের কথকতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪।

৩৬. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'কীটনাশকের কীর্তি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

৩৭. প্রাগুক্ত, : পৃ. ২৪২।

৩৮. প্রাগুক্ত, : 'যোগাযোগ', পৃ. ৪৭।

৩৯. প্রাগুক্ত, : 'যোগাযোগ', পৃ. ৫৮।

৪০. ইকবাল শহীদ : 'কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৪১. মজুমদার সুশান্ত : 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প : 'নতুন স্বর, সুর ও আস্বাদ', শৈলী (সম্পাদক

: কায়সুল হক), ২য় বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১ জানুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ. ৩১।

৪২. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : ‘রচনাসমগ্র - ১’, ‘ফেরারী’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৪৩. প্রাগুক্ত, : ‘খোঁয়ারি’, পৃ. ১১৬।

৪৪. প্রাগুক্ত, : ‘পিতৃবিয়োগ’, পৃ. ১৫৫।

৪৫. প্রাগুক্ত, : ‘প্রেমের গপ্পো’, পৃ. ৩৩৬।